দরসে হাদীস

মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন
প্রভাষক
কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া (কামিল) মাদরাসা
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান

কম্পোজ
মুহাম্মদ সিরাজুস্মুনীর শো'আঈব
মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দীন

প্রকাশকাল
১ অক্টোবর ২০০৯

হাদিয়া :
১০০ টাকা মাত্র

প্রকাশনায়
আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
৩২১, দিদার মার্কেট দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০। ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ৬৩৪২৪১, ৬২৪৩২২
e-mail:anjumantrust@yahoo.com,tarjuman@spnetctg.com

সূচি

১. সৃষ্টির মূল উৎস নূরে মোহাম্মদী..... ..০১
২. নবীপ্রেম সমস্ত ইবাদতের প্রাণ..... .....০৮
৩. নবীপ্রেম খোদাপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত.....১১
৪. নবীজির গোলামের কোন চিন্তা নেই..... .....১৭
৫. সমস্ত জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহর প্রিয় রসূল.....১৯
৬. ইলমে গায়্ব নবী করীমের নুবূয়তের অন্যতম দলীল.....২২
৭. হায়াতুন্ নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম..... ...২৭
৮. মক্বামে মাহমূদ.....৩২
৯. শাফা'আত : রসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অনন্য বৈশিষ্ট্য.....৩৫
১০. খতমে নুবূয়ত.....৪২
১১. যাঁরা হাশরের দিন আরশের ছায়ায় থাকবে.....৪৬
১২. হাত তুলে দো'আ-মুনাজাত করা.....৫০
১৩. মুহার্‌রম ও আশুরার রোযা.....৫৪
১৪. আহলে বায়তে রসূল কিশতিয়ে নূহ.....৫৮
১৫. শতাব্দির মুজাদ্দিদ.....৬৪
১৬. বিনা প্রয়োজনে মাথা মুণ্ডানো খারেজীদের আলামত.....৭০
১৭. নবীপ্রেমের বাস্তব প্রতিচ্ছবি সিদ্দীক্ব-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু.....৭৩
১৮. কদমবুচি শুধু জায়েয নয়, সুন্নাতে সাহাবাও.....৭৭
১৯. যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর.....৮১
২০. নবীজীর প্রতি জড়পদার্থের সম্মান.....৮৫
২১. কবরের উপর ফুল ছিটানো.....৮৯
২২. মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম.....৯৪
২৩. মি'রাজ রজনীতে নবীজীর স্বচক্ষে আল্লাহ'র দীদার লাভ.....৯৮
২৪. চলো মুসাফির মদীনার পানে.....১০৩
২৫. কেবল পানাহার বর্জনে রোযার সার্থকতা নেই.....১০৯
২৬. তারাবীর নামায আট রাক'আত নয়, বিশ রাক্'আত.....১১২
২৭. শাওয়ালের ৬ রোযা : সারা বছর রোযা রাখার সাওয়াব.....১১৭
২৮. নামাযে ইমামের পেছনে মুক্বতাদীর ক্বিরআত পাঠ না করা বং চুপে চুপে 'আ-মী-ন' বলা.....১২১
২৯. ক্বোরবানী ত্যাগের প্রোজ্জ্বল নিদর্শন.....১২৭
৩০. সাতটি চরিত্র মানুষকে ধ্বংস করে দেয়.....১৩১
৩১. হাদীস শরীফ চর্চাকারীদের জন্য নবী করীমের দো'আ.....১৩৪
৩২. প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী.....১৪০
৩৩. ওলী বিদ্বেষীরা খোদাদ্রোহী.....১৪৪

সৃষ্টির মূল উৎস নূরে মোহাম্মদী

عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَىْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ؟ قَالَ يَاجَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذَالِكَ النُّوْر يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذَالِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَااَرْضٌ وَلَاشَمْسٌ وَلَاقَمَرٌوَلَا جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ ـ فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذَالِكَ النُّوْر اَرْبَعَة اَجْزَاء فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِى اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءِ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِىْ الْكُرْسِىَّ وَمِنَ الثَالِثِ بَاقِىَ الْمَلَآئِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءَ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوّلِ السَّمٰوَاتِ وَمِنَ الثَّانِى الْاَرْضِيْنَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّار ... الخ ـ

অনুবাদ ঃ

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবেদন করলাম, এয়া রসূলাল্লাহ্! আমার মা-বাবা আপনার কদমে উৎসর্গিত, আপনি দয়া করে বলুন, সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা কোন বস্তুটি সৃষ্টি করেছিলেন? নবীজী এরশাদ করলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর পূর্বে তোমার নবীর (আমার) নূরকেই তাঁরই নূর হতে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর ওই নূর আল্লাহ্ তা'আলারই মর্জি মুতাবেক তাঁরই কুদরতি শক্তিতে পরিভ্রমণ করতে লাগল। ওই সময় না ছিল লৌহ-কলম, না ছিল বেহেশ্ত-দোযখ, আর ছিলনা আসমান- যমীন, চন্দ্র-সূর্য, মানব ও দানব। এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ যখন

সৃষ্টিজগত পয়দা করার মনস্থ করলেন, প্রথমেই ওই নূর মুবারক চারভাগে বিভক্ত করে প্রথম অংশ দিয়ে কলম, দ্বিতীয় অংশ দিয়ে লওহ, তৃতীয় অংশ দিয়ে আর্শ, সৃষ্টি করে চতুর্থাংশকে পুনরায় চারভাগে বিভক্ত করে প্রথমাংশ দিয়ে আর্শবহনকারী ফেরেশ্তাদের, দ্বিতীয় অংশ দ্বারা কুর্সী, তৃতীয় অংশ দ্বারা অন্যান্য ফেরেশ্তাদের সৃষ্টি করে চতুর্থাংশকে আবারও চারভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে সপ্ত আসমান, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে সপ্ত যমীন, তৃতীয় ভাগ দিয়ে বেহেশ্ত-দোযখ এবং পরবর্তী ভাগ দিয়ে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন।

[ইমাম কুস্তলানী : আল্ মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ১ম খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা। ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহিব, ১ম খন্ড, ৮৯-৯১ পৃষ্ঠা। হালভী : আস্সিরাতুল হালভিয়া, ১ম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা। আল্লামা আজলুনী : কাশফুল খেফা, ১ম খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা। শায়খ আবদুর রায্যাক : 'আল্ মুসান্নাফ'। ড.তাহেরুল কাদেরী : খাছাইছে মুস্তফা। নাবহানী : আল্ আনওয়ারুল মুহাম্মদিয়া ১৩ পৃষ্ঠা, ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত। ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি : সালাতুস্ সফা।]

হাদীসের বর্ণনাকারী

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। নবীপ্রেমে উৎসর্গিত এক তরুণ সাহাবী। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে দ্বিতীয় আকাবায় ইসলামের পতাকাতলে সমবেত, হন কম বয়সের কারণে বদর-উহুদের জিহাদে শরিক হতে না পারলেও পরবর্তীতে প্রায় ১০ জিহাদে অংশগ্রহণ করে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। মদীনার মসজিদে নবভী হতে এক মাইল দূরে তাঁর বাসস্থান হওয়া সত্ত্বেও পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে নবভীতেই জামা'আত সহকারে নিয়মিত আদায় করতেন। ঐতিহাসিক খন্দকের যুদ্ধে অবিরাম পরিশ্রম আর উপবাসের কারণে মুসলিম সৈন্যদের অবস্থা একেবারে কাহিল। এমনকি নবীজীর পবিত্র পেট মুবারকেও পাথর বাঁধা দেখে হযরত জাবের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে আর সামলাতে না পেরে বিদ্যুৎবেগে দৌঁড়ে ঘরে পৌঁছে বিবির কাছে জানতে পারলেন তাঁদের ঘরে সামান্য আটা আর একটি ছোট ছাগলছানা ছাড়া আর কিছুই নেই। বিবিকে নির্দেশ দিলেন ঠিক আছে এই ছাগলছানা জবাই করে রান্না কর; আর যৎসামান্য আটা যা-ই রয়েছে তা দিয়ে রুটি তৈরি কর, আমি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিয়ে আসি। এ কথা বলে আরেক দৌঁড়ে নবী করীমের খেদমতে এসে একেবারে কাছে গিয়ে কানে কানে দাওয়াতটা দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন নবী পাক সাথে যাঁরা যাবেন তাঁদের সংখ্যা যেন দশজন অতিক্রম না করে। দাওয়াত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীজী সৈন্যবাহিনীর কাছে ঘোষণা দিলেন সবাই জাবেরের বাড়িতে যাব। সেখানে খাবারের আয়োজন হয়েছে। নবী করীমের এই আম ঘোষণা শুনে হযরত জাবির রদিয়াল্লাহু আনহুর মাথায় যেন আকাশ

ভেঙ্গে পড়ল! ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। ছোট একটা বকরির বাচ্চা দিয়ে দশজনের বেশি খাওয়া কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে এ লোককে নবী করীম দাওয়াত দিয়ে দিলেন। কিন্তু আপত্তি-অভিযোগ করার কোন সাহস ছিল না। তবে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নবীর দরবারে কোন অভাব নেই। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে নিশ্চয়। এ চিন্তা করতে করতে নবী করীম সেনা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে তাঁর ঘরে এসে হাযির হলেন। এরপর সামান্য আটা যা ছিল তার উপর এবং বকরির রান্না করা গোশ্ত ও হাঁড়ির মধ্যে থুথু মুবারক নিক্ষেপ করলেন। তারপর খাবার পরিবেশন শুরু হল। নবী পাকের পবিত্র থুথু মুবারকের ওসীলায় খাবারের এতই বরকত হয়ে গেল যে, পর্যায়ক্রমে সেখান থেকে হাজার হাজার ক্ষুধার্ত লোককে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ানোর পরও প্রথম অবস্থায় খাবার যা ছিল তা'ই রয়ে গেল [সুবহানাল্লাহ]।

হাদীসের ব্যাখ্যা

গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করলে দেখা যায়, পবিত্র ক্বোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সূরার প্রতিটি আয়াতে কোননা কোনভাবেই আমাদের প্রিয়নবী হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়ার অন্য কোন সৃষ্টির সাথে তাঁর তুলনা হয় না। কারণ, তিনি সৃষ্টির মূল আর অন্যরা তাঁরই শাখা-প্রশাখা। তিনিই আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি এবং আল্লাহর দরবারে প্রথম আত্মসমর্পণকারী। যেমন পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-

قُلْ اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۔
لَاشَرِیْکَ لَہٗ وَبِذَالِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ

অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার নামায, হজ্ব, কোরবানী, আমার জীবন ও ওফাত বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই; যার কোন শরীক নেই এবং এ বিষয়ে আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলমান (আল্লাহর দরবারে আত্মনিবেদনকারী)। [সূরা আন্'আম, আ.১৬২-১৬৩।]

আলোচ্য আয়াতের শেষের অংশ 'আমিই প্রথম মুসলমান' থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই আল্লাহর দরবারে প্রথম আত্মসমর্পণকারী এমনকি মানবজাতির আদিপিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামের আগেও। শুধু তাই নয় মানবজাতির আগে জিনজাতির মধ্যে যারা আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণকারী ছিল তাদেরও পূর্বে। এমনকি ফেরেশতাদেরও পূর্বে। সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টিই আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণকারী ছিল। কেউ আগে আবার কেউ পরে। কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ বাধ্য হয়ে। যেমন এরশাদ হয়েছে

وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ کَرْهًا وَاِلَیْهِ یَرْجِعُوْنَ

অর্থাৎ আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে সকলই স্বেচ্ছায় হোক কিংবা বাধ্য হয়ে, তারই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই প্রতি সকলই প্রত্যাবর্তিত হবে।

[সূরা আলেইমরান, আ.৮৩।]

কাজেই সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী হলেন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং তিনিই সর্বপ্রথম সৃষ্টি। এভাবে পবিত্র ক্বোরআনের অনেক আয়াত রয়েছে যদ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুধাবন করা যায়, নবী করীম সৃষ্টির মূল উৎস ছিলেন এবং তাঁরই পবিত্র নূর হতে অন্যান্য জগত সৃজিত, যা হাদীস শরীফের ভাষ্য দ্বারা প্রতিভাত হয়েছে। তেমনি অপর এক হাদীস শরীফে রয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

کُنْتُ اَوَّلُ النَّبِیِّنَ فِی الْخَلْقِ وَاٰخِرُهُمْ فِی الْبَعْثِ

অর্থাৎ আমি সৃষ্টিগতভাবে প্রথম নবী আর দুনিয়াতে আগমনের দিক দিয়ে শেষ নবী। [দাইলামী : আল্ ফেরদাউস, ৩য় খন্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা; ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কোরআন আল্ আযীম, ৩য় খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা।]

হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম এরশাদ করেন-

کُنْتُ نُوْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَبِّیْ قَبْلَ خَلْقِ اٰدَمَ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ بِاَرْبَعَةِ عَشَرَ اَلْفَ عَامٍ

অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টির চৌদ্দহাজার বৎসর পূর্বে আমি আমার রবের দরবারে নূরের আকৃতিতে মওজূদ ছিলাম।

[কুস্তলানী : আল্ মাওয়াহেবুল্ লাদুনিয়া; আজলুনী : কাশফুল খেফা, ২য় খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা।]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন হালবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস শরীফ স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব 'সিরাতে হালাবিয়া'য় সঙ্কলন করেন-

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ جِبْرَائِیْلَ عَلَیْهِ السَّلَام فَقَالَ یَاجِبْرَئِیْلُ کَمْ عَمَرُکَ مِنَ السِّنِیْنَ ؟ فَقَالَ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَسْتُ اَعْلَمُ غَیْرَ اَنَّ فِی الْحِجَابِ الرَّابِعِ نَجْمًا یَطْلَعُ فِیْ کُلِّ سَبْعِیْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مَرَّةً رَأَیْتُهٗ اِثْنَیْنِ وَسَبْعِیْنَ اَلْفَ مَرَّةٍ ۔ فَقَالَ یَاجِبْرَئِیْلُ وَعِزَّةِ رَبِّیْ جَلَّ جَلَالُهٗ اَنَا ذَالِکَ الْکَوْکَبُ ۔

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞেস করলেন- ওহে জিব্রাঈল! আপনার বয়স কত? উত্তরে জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম বললেন, এয়া রসূলাল্লাহ্! আমি তাতো সঠিক জানি না। তবে এতটুকু বলতে পারি (সৃষ্টিজগত সৃষ্টির পূর্বে) আল্লাহ্ তা'আলার নূরানী আযমতের পর্দাসমূহের চতুর্থ পর্দায় একটি নূরানী তারকা সত্তর হাজার বছর পর পর উদিত হত। আমি আমার জীবনে সেই নূরানী তারকা বাহাত্তর হাজার বার দেখেছি। অতঃপর নবীপাক এরশাদ করলেন, মহান রব্বুল আলামীনের ইয্যাতের ক্বসম করে বলছি, সেই অত্যুজ্জ্বল নূরানী তারকা আমিই ছিলাম। [আল্ হালভী : আস্ সীরাতুল হালভিয়া, ১ম খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।]

উপরিউক্ত কোরআন-হাদীসের আলোচনা থেকেই বুঝা গেল রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির মূল উৎস। এরপরেও একশ্রেণীর লোক বলে বেড়ায় নবী আমাদের মত সাধারণ মানুষ, মাটির তৈরি মানুষ, দোষে-গুণে মানুষ, তিনি অতিমানব নন, না নূরের তৈরি ইত্যাদি। [গোলাম আযম : সিরাতুন্ নবী সঙ্কলণ।]

আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয়হাবীবকে এমন অসংখ্য নূরানী ও অনন্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা অন্য মানুষতো দূরের কথা অন্য নবীকেও দেওয়া হয়নি। এ বিষয়টি তন্মধ্যে অন্যতম। কাজেই হাদীস শরীফের ভাষ্যমতে নবী করীমের নূর মুবারক তখনই সৃষ্টি করা হয়েছিল যখন মাটিতো দূরের কথা আর্শ, কুর্সী, লওহ্, কলম তথা সৃষ্টিকুলের কোন কিছুই সৃষ্টি করা হয়নি। সুতরাং কীভাবে এ কথা তারা বলার দুঃসাহস দেখায়, নবী আমাদের মত মাটির তৈরি? [গোলাম আযম : সিরাতুন্ নবী সঙ্কলণ]

তারা বলে নবী আমাদের মত। কারণ, তিনি খাবার খেয়েছেন, বাজার করেছেন, সংসার করেছেন ইত্যাদি। তাহলে আমরা বলব এ যুক্তি তো কাফিরদেরই। পবিত্র ক্বোরআনে এসেছে কাফিররা নবী করীমের উপর ঈমান না আনার জন্য এ হেন খোঁড়া যুক্তি প্রদর্শন করেছিল, **مَالِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ** অর্থাৎ ''এ রসূলের কী হয়েছে (ইনি কিভাবে রসূল হতে পারেন) যিনি খাবার খান এবং বাজারে চলাফেরা করেন।'' সুতরাং কাফিরদের কথার সাথে সূর মিলিয়ে কেউ যদি নিজেদেরকে কাফিরদের দলভুক্ত করে নিতে চায় তাহলে আমাদের করার কী আছে?

তারা বলে বেড়ায় নবী কিভাবে নূরের তৈরি, তিনিতো আমাদের মত রক্তমাংসে গড়া মানুষ। তাহলে আমরা বলব সহীহ হাদীস শরীফে দেখা যায়, নবী পাকের পবিত্র দেহ মুবারকে কোন দিন মশা- মাছি বসেনি; অথবা সুযোগ পেলেই মশা-মাছি আমাদের শরীরের রক্ত টেনে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। নবী পাকের নূরানী দেহ আর আমাদের দেহ কোন দিন এক হতে পারে না। সাধারণ মানুষ মারা

যাওয়ার পর কবরে তাদের দেহ মাটির সাথে মিশে যায়। কিন্তু নবীগণের দেহ মোবারক কবরের মাটিতে বিলীন হয় না। আর আমাদের নবীর শানতো অনেক উর্ধ্বে। হাদীস পাকে এসেছে,

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاء

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক (ইন্তিকালের পর) নবীগণের দেহ মুবারক খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। [ফাদলুস্ সালাওয়াত।]

তারা বলে আমাদের যেমন শরীরে রক্ত আছে নবীর শরীরেও রক্ত ছিল তিনি কি আমাদের মত নন? বড় দুঃখের সাথে লক্ষ করছি আমরা নবীর উম্মত হয়ে এই এক শ্রেণীর লোক ছলে-বলে- কৌশলে চাচ্ছে যে, নবী তাদের মতই হোক, আর তারা নবীর মত হয়ে যাক (নাঊযুবিল্লাহ্)।

তাহলে আমরা তাদের প্রত্যেকের কাছে জানতে চাই, তুমি কি জান তোমার রক্ত নাপাক, খাওয়াতো দূরের কথা কারো গায়ে লাগলেও ধুয়ে ফেলা আবশ্যক? কিন্তু নবী পাকের রক্ত মুবারক নাপাক ছিল বলে শরীয়তের কোন প্রমাণ দেখাতে পারবেন কি? বরং নবী করীমের রক্ত মুবারকের পবিত্রতার উপর অসংখ্য হাদীস শরীফ বিদ্যমান। ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধে নবী করীমের দাঁত মুবারক শহীদ হওয়ার পর মুখ দিয়ে যখন রক্ত ঝরে পড়ছিল তখন সাহাবীরা গিয়ে হাত বসিয়ে দিয়েছিলেন এবং এক বিন্দু রক্তও মাটিতে পড়তে দেন্নি। নবীজী ওই রক্ত মুবারক হিফাযত করার জন্য সাহাবী হযরত মালিক ইবনে সিনান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে কেউ দেখতে না পায়। যুদ্ধের মাঠে নবী করীমের সেই রক্ত মুবারক হিফাযতের এমন কোন জায়গা খুঁজে পেলেন্ না যেখানে কেউ দেখবে না। পরিশেষে বুদ্ধি করে চুমুক দিয়ে রক্তের সবটুকুই পান করে নিলেন। পরবর্তীতে নবী করীম ওই রক্ত মুবারকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, হুযূর এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি যেখানে দুনিয়ার কোন মানুষ দেখতে পাবে না। নবী করীম জায়গাটির কথা জানতে চাইলেন। উত্তরে বললেন, হুযূর সেই নূরানী রক্ত মুবারক দুনিয়ার কোথাও রাখা আমার পছন্দ হয়নি তাই আমি তা নিজেই পান করেছি। প্রেমিক সাহাবীর এ ধরনের মুহাব্বত দেখে নবী করীম মুচকি হাসলেন আর সুসংবাদ দিলেন, যে পেটে আমার রক্ত পৌঁছেছে সে পেটকে কোনদিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। [আল্ বুরহান।]

ওহাবী-খারেজী, দেওবন্দী, ক্বাদিয়ানী, মওদূদীবাদের অনুসারীরা কি কোন দিন প্রমাণ করতে পারবে- তাদের রক্ত পবিত্র এবং সেই রক্ত পানে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ দিতে পারবে? তাহলে কেন ওই সব শয়তানী যুক্তি দিয়ে

সরলপ্রাণ মুসলিম মিল্লাতকে গোমরাহ্ করা হচ্ছে ?

আসলে নবীপাকের শান-মান শুনলে ঈমানদারের ঈমান মজবুত হয় আর শয়তানের মন হয়ে যায় দুঃখ ভারাক্রান্ত। যারা নবীপাকের সুউচ্চ শান-মান সহ্য করতে পারে না, তারা শয়তানের প্রেতাত্মা নয় কি? ঈমানদার সব সময় ক্বোরআন-হাদীসের আলোকেই কথা বলবে। কোন যুক্তি তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। মহান আল্লাহ্ যেখানে তাঁর প্রিয় নবীর শান ও মান-মর্যাদাকে বুলন্দ করেছেন সেক্ষেত্রে নবীর দুশমনেরা হাজার চেষ্টা করলেও কোন কাজ হবে না।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবীর মাসে নবীপ্রেমিকরা উজ্জীবিত হয়, নব উদ্যমে তাঁদের মুখে মুখে থাকে প্রিয়নবীর প্রশংসাগীত। তিনিই আল্লাহ্র নূর, তিনিই সমস্ত সৃষ্টির রহমত এবং তিনিই সৃষ্টির মূল উৎস।

নবী মোর নূরে খোদা, তাঁরই তরে সকল পয়দা
আদমের কলবেতে তাঁরই নূরের রৌশনী।।
নবীর মোর পরশমণি।

---><---

নবীপ্রেম সমস্ত ইবাদতের প্রাণ

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه اَنَّ رَجُلًاقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى اَلسَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَااَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَااَعْدَدْتُ لَهَااِلَّااَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ رضي الله عنه فَمَارَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْابِشَىْءٍ بَعْدَالْاِسْلَامِ فَرْحَهُمْ بِهَا۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِشْكٰوة صفحه ٤٢٦

অর্থাৎ, হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবেদন করলেন, এয়া রসূলাল্লাহ্! কেয়ামত কখন হবে? উত্তরে আল্লাহ্র রসূল জিজ্ঞেস করলেন, ক্বিয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি আরয করলো, তজ্জন্য আমি তেমন কোন প্রস্তুতি নিতে পারিনি; তবে আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসি। এবার হুযূর এরশাদ করলেন, ''তুমি যাকে ভালবাস ক্বিয়ামত দিবসে তুমি তার সাথেই থাকবে।'' (এ হাদীসের বর্ণনাকারী) হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ''ইসলামের আবির্ভাবের পরে আমি মুসলমানদেরকে এরূপ আর খুশি হতে দেখিনি, যেরূপ এ কথাটুকু শুনে খুশি হয়েছেন।''

[সূত্র : বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড ৯১১ পৃষ্ঠা, মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড ৩৩১ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ৪২৬ পৃষ্ঠা]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নবীপ্রেমই খোদাপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত। কারণ আল্লাহ্ পাক স্বয়ং ক্বোরআনে ইঙ্গিত দিয়েছেন, আমাকে কেউ ভালবাসতে চাইলে কিংবা আমার ভালবাসা পেতে চাইলে, সে যেন আমার হাবীবের আনুগত্য করে, এক কথায় আমার নবীর গোলামী করে। আর আল্লাহ্র হাবীব এরশাদ করেছেন, ''ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে বেশি প্রিয় হব না তার মাতাপিতা, সন্তান-সন্ততি, মানুষ ও সবকিছুর চেয়ে।''

[বুখারী শরীফ : ১ম খণ্ড : ৭১ পৃষ্ঠা]

পবিত্র ক্বোরআন-হাদীস'র সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায়ও প্রতীয়মান হয়, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি যত বড় নামাযী, রোযাদার, দানবীর তথা ইবাদতকারী হোকনা কেন যদি তার অন্তরে নবীর প্রেম-ভালবাসা স্থান না পায়, তাহলে তার ওইসব ইবাদত, নামায, রোযার কোন মূল্য নেই। কারণ, ঈমানদার হওয়ার জন্য নবীর মুহাব্বত প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব তথা আবশ্যক। আর নামাযের ভিতরেও আল্লাহ্র নবীর

উপর দুরূদ পড়া ও আল্লাহ্‌র হাবীবকে সালাম দেওয়া ওয়াজিব। আর সালাম প্রদানের সময় নবীজীর স্মরণ অন্তরে একাগ্রতার সাথে রাখা বাঞ্ছনীয়। আনমনা, তথা অন্যমনস্ক হয়ে নামায পড়া হলে, তা পরিপূর্ণ নামায নয় বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আর মহান রব্বুল আলামীন হুঁশিয়ারবাণী উচ্চারণ করেছেন- ''ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লী-না ল্লাযী-নাহুম 'আন সালা-তিহিম সা-হূ-ন'' (ঐসব নামাযীদের জন্য রয়েছে ধ্বংস, যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে অন্যমনস্ক থাকে।) তাই উদ্ধৃত ক্বোরআন-হাদীসের বাণীদ্বয় আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে নামাযেও রসূলকে স্মরণ করা একান্ত আবশ্যক। অথচ ওহাবীরা বলে নামাযের মধ্যে নবীর খেয়াল আসা গাধা- গরুর খেয়াল আসার চেয়েও বেশি খারাপ (না'ঊযু বিল্লাহ্‌)।

নবীর ভালবাসা কেমন হওয়া চাই, তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন, আমীরুল মুমিনীন সিদ্দীক্ব-ই আকবর হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। হিজরতের রাত 'সওর' পর্বতে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ছোট ছোট সকল গর্ত বন্ধ করে সর্বশেষ গর্তটি বন্ধ করার কিছু না পেয়ে নিজের পা দিয়ে গর্তের মুখ ঢেকে রেখেছিলেন, যাতে বিষাক্ত কিছু ওই গর্ত দিয়ে এসে আল্লাহ্‌র রসূলের আরামের ব্যাঘাত করতে না পারে। সর্বশেষ ওই গর্তেই বিষাক্ত সাপ এসে ছোবল মারলে সিদ্দীক্ব-ই আকবরের সমস্ত শরীর নীল হয়ে এক পর্যায়ে শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। নিজের প্রাণ চলে যাবার উপক্রম হয়েছিল এমন মুহূর্তে সিদ্দীক্ব-ই আকবর নবীজীর ঘুম ভেঙ্গে যাবে, কষ্ট হবে এমন ভেবে একটু শব্দও করেননি। এক কথায় প্রাণের চেয়েও বেশি নবী-ই পাকের আরামকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এত গেল কেবল একটা দৃষ্টান্ত। এরকম হাজারো দৃষ্টান্ত হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন তাইতো একদা আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র প্রশ্নের উত্তরে হুযূর করীম বলেছিলেন- আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যার চেয়েও বেশি আমল করেছে ফারূক্ব-ই আ'যম হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব। আর ওমরের এ ইবাদতের চেয়েও তোমার পিতা আবূ বকরের এক রাতের ইবাদত শ্রেষ্ঠ। [মিশকাত শরীফ : কিতাবুল মানাক্বিব]

দেখুন! আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সারা জীবনের ইবাদতে বিভিন্ন প্রকারের আমল ছিল। যেমন- নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, যিক্‌র্‌-আয্‌কার, তাসবীহ-তাহলীল, জিহাদ, ন্যায় বিচার আরো কত ইবাদত। এসব আমলের সমষ্টির চেয়েও সিদ্দীক্ব-ই আকবরের মাত্র এক রাতের আমল তার চেয়েও বেশি ভারী। মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে এখানে যে রাতের কথা বলা হয়েছে, সেটি হল- হিজরতের রাত,

যে রাতে তিনি নিবেদিত প্রাণ হয়ে আল্লাহ্‌র রসূলকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। প্রশ্ন হল- এমন কী আমল করেছিলেন তিনি সে রাতে, কিংবা কত হাজার রাক'আত নামায পড়েছিলেন; আর কীইবা দান-সাদাক্বাহ্‌ করেছিলেন? না, তিনি এমন কিছুই করেননি, তিনি শুধু নিজের প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি ভালবেসেছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূলকে। আর নবীর প্রতি এক রাতের অকৃত্রিম ভালবাসা মহান আল্লাহ্‌র কাছে ফারূক্ব-ই আ'যম হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মত মহান সত্ত্বার সারাজীবনের অসংখ্য ইবাদত-আমলের চেয়ে বেশি প্রিয় ও মূল্যবান হয়ে গেল।

তাই বুঝা যায়, নবীপ্রেমই ইবাদতের মূল। স্মর্তব্য, কেবল নবীর মুহব্বত দাবি করে আমল ছেড়ে দিলাম, তা মোটেই হতে পারেনা। আশিক্ব-ই রসূল নাম দিয়ে নামায, রোযা, ইত্যাদি ইবাদত বন্দেগী করতে হবেনা এমন ফতোয়া আজ পর্যন্ত কেউ দেননি। সুতরাং, আমল ছাড়া নবীপ্রেম দাবি করা প্রতারণার নামান্তর। তাই ঈমানের দাবি নিয়ে আল্লাহ্‌র রসূলকে প্রকৃতভাবে ভালবাসতে হবে এবং আল্লাহ্‌র হাবীবের প্রতিটি সুন্নাতকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবেসে আঁকড়ে ধরতে হবে-অনুসরণ করতে হবে, তবেই হবে প্রকৃত মুমিন-মুসলমান। নবীপ্রেম আছে তো ঈমান আছে, সাথে আমলও এসব মিলেই হবে সোনায় সোহাগা।

এ পার্থিব জীবন স্বল্প, আর পরকালীন জীবন অন্তহীন। সেই অনন্ত জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির কামনা সবার হৃদয়ে থাকাটা স্বাভাবিক। তাই সাহাবীগণ প্রায় সময়ই সে পরকালীন জীবনের বিষয়ে নবীজীর কাছে জানতে চাইতেন, আর পরকালীন জীবন নিয়ে খুবই চিন্তিত-বিমর্ষ থাকতেন। তেমনি একজন সাহাবীর আবেদন ফুটে ওঠেছে উল্লিখিত হাদীস শরীফে। ক্বিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য আর তৎপরবর্তী অবস্থা ও ঠিকানা যে কী হবে! ইত্যাদি অন্তরে রেখে সামান্য প্রশ্ন করতেই ইল্‌মে গায়বের নি'মাতপ্রাপ্ত নবীকুল সরদার হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জবাব না দিয়ে বরং তার অন্তরে লুক্কায়িত পরবর্তী তথা চূড়ান্ত প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন, তুমি ক্বিয়ামত পরবর্তী বেহেশ্‌ত- দোযখের মধ্যে কোথায় থাকবে, সেটা জানতে চাচ্ছ। তাই জেনে নাও, তোমার অন্তরে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের ভালবাসা যদি থেকে থাকে, তাহলে তুমি বেহেশ্‌তে রসূলের সাথেই থাকবে। সুবহানাল্লাহ্‌! এভাবে আরো কত সাহাবীকে নবী-ই আকরাম দুনিয়ায় থাকাবস্থায় বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। নবী করীম এরশাদ করেন, ''যে যাকে ভালবাসে, সে তার সাথেই থাকবে।'' আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে নবীপ্রেমিক হিসেবে কবূল করুন; আ-মীন।

---><----

নবীপ্রেম খোদাপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

অর্থ: হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- তোমাদের কেউ ততক্ষণ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য লোকের চেয়ে প্রিয় হব না। [বুখারী ও মুসলিম]

হাদীসের বর্ণনাকারী

হযরত আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন। তাঁর আম্মাজান মাত্র দশ বৎসর বয়সেই তাকে নবীজীর খিদমতে হাযির করে বললেন, এয়া রসূলাল্লাহ! এটা আপনার ছোট খাদেম; তার জন্য একটু দো'আর আবেদন করছি। নবী করীম দো'আ করলেন, ''আল্লাহুম্মা বারিক ফী মা-লিহী ওয়া ওয়ালাদিহী ওয়া আত্বিল ওমরাহূ ওয়াগ্‌ফির্ যাম্বাহূ।'' (হে আল্লাহ! তার সম্পদ এবং বংশধরে বরকত দান কর, তার হায়াত বৃদ্ধি কর এবং তার গুনাহ্ মাফ করে দাও)।

হাদীসের ব্যাখ্যা

নবীপ্রেমই ঈমানের পূর্বশত। অন্তরে যার নবীর মুহাব্বত নেই, হাজারো দাবি করলে কিংবা রাতদিন আমল করলেও পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া যাবে না। মানুষ সাধারণতঃ তার সন্তান-সন্ততি, মা-বাবাকে এ বিশ্বসংসারে বেশি ভালবাসে। তাদের প্রতি ভালবাসা মুহাব্বত যতই হোকনা কেন নবীর মুহাব্বত তার চেয়েও অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুনিয়ার অন্য কোন বস্তুর মুহাব্বত নবীর মুহাব্বতের চেয়ে কোন অবস্থাতেই অধিক হতে পারবে না। আলোচ্য বিষয়ের সমর্থনে পবিত্র ক্বোরআনেও অনেক আয়াত পরিলক্ষিত হয়। যেমন, এরশাদ হয়েছে-

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ

অর্থাৎ, হে প্রিয় নবী! আপনি বলে দিন, ওহে লোকসকল! তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, পরিবার-পরিজন তোমাদের অর্জিত সম্পদ তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার লোকসানের আশঙ্কা তোমরা করে থাক, তোমাদের পছন্দনীয় বাসস্থান ইত্যাদি যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তার রসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয় তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তাঁর নির্দেশে (আযাব) প্রেরণ করবেন। আর আল্লাহ্ ফাসিক্বদেরকে হেদায়ত করেন্ না। [সূরা তাওবা, আয়াত ২৪]

উল্লিখিত আয়াতে ঈমানদারদের জন্য তার জাগতিক সকল সম্পদের উপর ভালবাসার পাত্র হিসেবে মানদণ্ড স্বয়ং রব্বুল আলামীন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তাহল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি মুহাব্বত। তবে এ আয়াতে এটা বলা হয়নি যে তোমরা তোমাদের মাতাপিতার মুহাব্বত ছেড়ে দাও। এটাও বলা হয়নি যে, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির মুহাব্বত পরিত্যাগ কর; বরং এতটুকু ইঙ্গিত রয়েছে তাদের প্রতি তোমাদের মুহাব্বত -ভালবাসা যতই হোকনা কেন, নবীর প্রতি মুহাব্বত যেন তার চেয়েও অধিক হয়। আলোচ্য হাদীস শরীফে নবী-ই আকরাম সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যা মূলতঃ পবিত্র কোরআনেরই ভাবার্থ। নবীর মুহাব্বতই মূলতঃ ঈমানের মূল চালিকাশক্তি। আল্লামা ইকবালের ভাষায়-

مغز قران روح ایمان جانِ دین
ہست حبّ رحمۃ للعالمین ﷺ

অর্থাৎ কোরআনের মগজ ঈমানের রূহ আর দ্বীনের প্রাণশক্তিই হল রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত।

হযরত আনাস বিন মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস শরীফে রয়েছে-

اِنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلٰوةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَصَدَقَةٍ وَلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ ـ

অর্থাৎ জনৈক লোক নবীজীর দরবারে এসে জানতে চাইলেন যে, এয়া রসূলাল্লাহ্! ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? নবীজী তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি সেই ক্বিয়ামত দিবসের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? উত্তরে লোকটি বললেন, আমি সেদিনের জন্য বেশি পরিমাণে নামায-রোযা কিংবা অধিক সাদক্বার ব্যবস্থা করতে পারিনি তবে (আমার একটা সম্বল আছে) আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসি। অতঃপর নবীজী এরশাদ করলেন, তুমি যাকে ভালবাস ক্বিয়ামত দিবসে তার সাথেই থাকবে। [বুখারী শরীফ, ৯১১ পৃষ্ঠা]

নবীর মুহাব্বতে সাহাবায়ে কেরামের ত্যাগ

সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে নবীপ্রেমের যে নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, তা অন্য কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় না। খোলাফায়ে রাশিদীনের ত্যাগ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। হিজরতের রাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মুহাব্বত ও ত্যাগের নিদর্শন দেখিয়েছেন তা বিশ্ববাসীকে রীতিমত হতবাক করে দেয়। তাবুকযুদ্ধের প্রাক্কালে নবীর মুহাব্বতে তিনি ঘরের সব সহায় সম্পত্তি নবী-ই পাকের কদমে এনে হাযির করে দিয়েছিলেন; এমনকি চুলোর ছাই পর্যন্ত। নবী-ই পাক জিজ্ঞেস করলেন, আবূ বকর! তুমি সবই তো নিয়ে এলে। পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ? জবাবে তিনি বলেছিলেন, اَبْقَيْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ - ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আমার পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকেই রেখে এসেছি।

এমনি দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীতে অসংখ্য নবীপ্রেমের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। একদা এক মুসলমান ও ইহুদির মধ্যখানে কোন বিষয়ে ঝগড়া হলে তার ফায়সালার জন্য নবীকরীমের দরবারে আসে। আর নবী করীম সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা দিলেন ইহুদির পক্ষে মুসলমানের বিপক্ষে। এতে মুসলমান লোকটি রসূলের ফায়সালায় সন্তুষ্ট হতে পারল না। পরবর্তীতে হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে গিয়ে দ্বিতীয়বার বিচারপ্রার্থী হল। ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উভয়ের জবানবন্দি শুনার এক পর্যায়ে জানতে পারলেন যে, ইতোপূর্বে নবী করীম তাদের উভয়ের মাঝখানে ফায়সালা করে দিয়েছেন। জানার পর আর কোন কথাবার্তা না শুনে গৃহের অভ্যন্তরে গিয়ে নাঙ্গা তরবারী এনে ওই মুসলমান ব্যক্তিটির গর্দান উড়িয়ে দিয়ে বললেন, যে রসূলের ফায়সালার পর আবার ফয়সালা চায় তার ফয়সালা এটাই (অর্থাৎ কতল)।

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠধনী ছিলেন। তাঁর সিংহভাগ সম্পত্তিই নবী করীমের খিদমতে, ইসলামের কল্যাণে খরচ করেছিলেন।

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নবীপ্রেমের নিদর্শন সবার জানা। কোন এক সফর হতে ফেরার সময় বিকাল বেলা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কোলে মাথা মুবারক রেখে আরাম করছিলেন। ইত্যবসরে সূর্য ডুবে যাচ্ছিল, অথচ মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আসরের নামায পড়েননি। একবার ভাবলেন রসূলকে ঘুম থেকে উঠাবেন। আবার ভাবলেন, যে নবীর উসিলায় নামায পেয়েছি সে নবীর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটিয়ে নবীকে কষ্ট দিয়ে নামায পড়ব, তা হতে পারে না। এসব ভাবতে ভাবতে সূর্য অস্ত গেল। নামায

পড়তে না পারায় দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে চোখে পানি এল। নিজের অজান্তে নবী করীম চেহারা মুবারকে অশ্রুফোঁটা পড়লে নবী পাক ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলেন, আলীর চেহারা মলিন। নবীপাক জানতে পারলেন খিদমত করতে গিয়ে আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আসরের নামায ক্বাযা করেছেন। নবী করীম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এ বলে হাতের ইশারা করলেন আর এদিকে ডুবন্ত সূর্য পুনরায় আকাশে উদিত হয়ে গেল। আর এ সুযোগে আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্হাহুল কারীম আসরের নামায আদায় করে নিলেন। কবি বলেন-

ماہ پارہ ہوا سورج اُلٹا پھیرا ☆ جب اشارا تمہارا ذرا ہو گیا

"চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছে সূর্য পুনরায় ফিরে এসেছে, যখনই আপনার সামান্য ইঙ্গিত হয়েছে।" এভাবে অসংখ্য ঘটনা সাহাবায়ে কেরামের জীবনীতে দেখা যায়।

উহুদযুদ্ধে কাফির-মুশরিকরা চতুর্দিক থেকে যখন নবীপাককে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ শুরু করল, ওই মুহূর্তে নবীপ্রেমে নিবেদিত সাহাবী হযরত তালহা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু দৌড়ে গিয়ে মানবঢাল সেজে গেলেন। কখনো বুক পেতে দিয়ে কখনো পৃষ্ঠদেশ পেতে দিয়ে কাফিরদের মোকাবিলা করতে লাগলেন যাতে নবীপাক শরীর মুবারকে কোন তীরের আঘাত না লাগে। সেদিনকার হযরত তালহা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এ ত্যাগ ও কোরবানী দেখে নবীপাক এরশাদ করেছিলেন, "আজকের উহুদের মুজাহিদদের জন্য যত ফযীলত বরাদ্ধ করা হয়েছে, তন্মধ্যে অর্ধেক ফযীলত দেয়া হয়েছে কেবল তালহার জন্য।

নবীর মুহাব্বতে আরবের সে যুবক সাহাবীরা নিজের জান-মাল উৎসর্গ করতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করেননি। আ'লা হযরত চমৎকার বলেছেন।

حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زناں

سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب

অর্থাৎ, হযরত ইঊসুফ আলাইহিস্ সালামের সৌন্দর্য দেখে মিসরের রমণীরা তাদের আঙ্গুল কেটেফেলেছিল আর (ইয়া রসূলাল্লাহ!) আপনার নামে আরবের যুবকরা তাঁদের শির কাটাতেও দ্বিধাবোধ করেননি। [হাদাইক্ব-ই বখশীশ]

হযরত হাস্সান বিন সাবিত, হযরত কা'ব ইবনে যুহাইর থেকে শুরু করে আরবের তৎকালীন বড় বড় কবি তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে নবীর শানে অবমাননাকারী বেদ্বীনদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ নবীর মুহাব্বত ঈমানদারের অন্তরে তার অন্যান্য সহায় সম্পত্তি তো বটেই; নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক

সহায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। পবিত্র ক্বোরআনে এসেছে اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ নবী মুমিনদের প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে। তাই নবীর শানে অবমাননাকর কোন কাজ, কোন কথাতো ঈমানদার করতে কিংবা বলতে পারেই না; বরং অন্য কেউ করলে কিংবা বললে কোন ঈমানদার সেটা সহ্য করে নীরবে বসে থাকতে পারেনা। এমনকি স্বয়ং রব্বুল আলামীনও সেটা সহ্য করেন্ না।

কাফির নেতা আবূ লাহাব নবীজীর শানে অবমাননা করেছে। তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ পাক পবিত্র ক্বোরআনের সূরা নাযিল করে তার পরিবার-পরিজনসহ সবার উপর লা'নত দিয়েছেন। ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা নবীজীর শানে বেআদবী করেছে আল্লাহ্ পাক পবিত্র ক্বোরআনে তাকে জারজ সন্তান বলে তার স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

সুতরাং, রসূলের দুশমন তথা অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদমুখর হওয়া পবিত্র ক্বোরআনের শিক্ষা। যুগে যুগে ইহুদি-নাসারারা ইসলামের উপর পবিত্র ক্বোরআনের উপর, নবী-রসূলের শানে নানা কৌশলে অপপ্রচার চালিয়ে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে। কিন্তু নবীপ্রেমিক মুসলিম মিল্লাত বিশেষ করে যামানার মুজাদ্দিদ ও আউলিয়া কেরামের আধ্যাত্মিক শক্তি আর ওলামায়ে কেরামের কঠোর প্রতিবাদ ও পরিশ্রমের সামনে এদের সকল ষড়যন্ত্র ইতিহাসের চোরাবালিতে নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে।

মূলতঃ কাফিরদেরকে সাময়িক সুযোগ দিয়ে আল্লাহ্ পাক ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। সে পরীক্ষায় দুর্বল ঈমানদারগণ বিপর্যস্ত হয়ে গেলেও সত্যিকার ঈমানদারগণ গর্জে ওঠেন খোদাদ্রোহী সেই অপশক্তির বিরুদ্ধে। জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন নবীর দুশমনদের মোকাবিলায়। ইমাম আ'যম আবূ হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদ-ই আল্ফে সানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত শাহ্ জালাল ইয়ামনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখের ইতিহাস আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে চিরভাস্বর।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, পৃথিবীতে দেড়শ' কোটি মুসলমানের অস্তিত্বকে সামনে রেখে ড্যানিশ পত্রিকা রসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অবমাননাকর ব্যঙ্গচিত্র ছেপেছে, তা ভাবতেও রীতিমত অবাক লাগে। যেখানে ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে মাত্র ৩১৩জন মর্দে মুজাহিদের সামনে কাফিরদের বিশাল বাহিনী পালাতে বাধ্য হয়েছিল, সেক্ষেত্রে এত অধিক সংখ্যক মুসলমান থাকার পরও কেবল ঐক্যের অভাবে খোদাদ্রোহী অপশক্তি এ জঘণ্য কাজটা করার দুঃসাহস দেখালো। কারণ, মুসলমান নেতৃবর্গের হৃদয় থেকে ইহুদি-নাসারারা ইতোমধ্যে নবীপ্রেমের সেই শক্তিটা সুকৌশলে ছিনিয়ে নিতে

সক্ষম হয়েছে। মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী (ওআইসি)ও কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারল না। তাই এখন প্রয়োজন হয়েছে প্রতিটি ঘরে ঘরে নবীপ্রেমিকের দূর্গ গড়ে তোলা। নবীর মুহাব্বতে প্রতিটি মুসলমানকে উজ্জীবিত করতে পারলে সকল অপশক্তি তাদের পদচুম্বন করতে বাধ্য হবে।

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں

আল্লাহ্কে যে পাইতে চায় হযরতকে ভালবেসে
আর্শ-কুরসী, লাওহ-কলম না চাইতেই পেয়েছে সে।

--><--

নবীজির গোলামের কোন চিন্তা নেই

عَنْ اِبْنِ الْمُنْكَدِرِ اَنَّ سَفِيْنَةَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِA اَخْطَأَ الْجَيْشَ بِاَرْضِ الرُّوْمِ اَوْ اُسِرَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا يَلْتَمِسُ الْجَيْشَ فَاِذَا هُوَ بِالْاَسَدِ فَقَالَ يَا اَبَا الْحَارِثِ اَنَا مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ A كَانَ مِنْ اَمْرِىْ كَيْتَ وَكَيْتَ فَاَقْبَلَ الْاَسَدُ لَه‘ بَصْبَصَةٌ حَتّٰى قَامَ اِلٰى جَنْبِهٖ كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا اَهْوٰى اِلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَمْشِىْ اِلٰى جَنْبِهٖ حَتّٰى بَلَغَ الْجَيْشَ ثُمَّ رَجَعَ الْاَسَدُ۔

অনুবাদ

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার গোলাম হযরত সফীনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রোম সম্রাজ্যে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর কাছে পৌঁছার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন অথবা কোন যুদ্ধে বন্দীশালা হতে বের হয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে দৌড়াচ্ছিলেন এমতাবস্থায় হঠাৎ একটি বাঘ সামনে হাজির। তিনি বাঘকে সম্বোধন করলেন- হে আবুল হারেছ (আরবী ভাষায় বাঘের উপনাম) আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার গোলাম। অতঃপর অবস্থা এমন হল যে, ওই বাঘটি কুকুরের মত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে নিকটে আসল। একপর্যায়ে তাঁর একপাশে এসে অবস্থান নিল আর যখনই কোন জন্তুর আওয়াজ শুনে তৎক্ষণাৎ সেদিকে দৌড়ে যায় আবার ফিরে আসে। এভাবে সম্মুখপানে যেতে যেতে সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। অতঃপর বাঘ ফিরে গেল। [মিশকাত শরীফ ৫৪৫ পৃষ্ঠা]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদের নবীকে কেবল মানব জাতির জন্য নয়; বরং আঠার হাজার সৃষ্টিজগতের জন্য নবী ও রহমত করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তাই আকাশের পাখী, সাগরের মাছ আর জঙ্গলের প্রাণীরাও তাঁকে চিনত এবং গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। এমনকি নবী করীমের নাম শুনলেও তাদের অবনত মস্তক নিবেদিত হত। এসব তারই অন্যতম মু'জিযা আর বিশাল ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। তেমনি একটি ছোট ঘটনার বর্ণনা আলোচ্য হাদীস শরীফে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা জালালুদ্দীন সয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি খাসা-ইসে কোবরা কিতাবে এ ধরনের অনেক ঘটনার উদ্ধৃতি সংকলন করেছেন।

নিম্নে কয়েকটি পাঠক সমীপে উপস্থাপন করা গেল-

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বনী সালমার এক ব্যক্তির পানি সেচের উট ক্ষিপ্ত হয়ে তার উপর হামলা করল, এভাবে পানি সিঞ্চনে বিঘ্ন ঘটায় খেজুর বাগিচা শুকিয়ে যেতে লাগল। ঘটনাটি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলে তিনি বাগানের দরজায় এসে হাজির হলেন। এক সাহাবী দৌঁড়ে এসে বললেন এয়া রাসূলাল্লাহ বাগানের ভিতরে যাবেন না। কারণ ক্ষিপ্ত উটটি সবাইকে কষ্ট দিচ্ছে। কিন্তু নবী করীম বললেন, তোমরা নির্ভয়ে বাগানে প্রবেশ করো। উট কাউকে কিছু করবে না। যেমন কথা তেমন বাস্তবতা। এতক্ষণ ধরে দৌঁড়াদৌড়ি করা সেই উটটি নবীপাকের নূরানী চেহারা দেখা মাত্রই শান্ত হয়ে গেল আর অবনত মস্তকে তাঁর কদমে এসে হাজির হয়ে গেল। এবং গর্দান ঝুঁকিয়ে সাজদাহ্ করল। এদিকে নবী করীম ঘোষণা দিলেন উটের মালিক কোথায় চলে এসো আর উটের লাগাম পরিয়ে দাও।

অপর বর্ণনায় রয়েছে- একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উপস্থিত ছিলেন এমন সময় একটি উট ছুটে এসে তাঁর ক্রোড়ে মস্তক রেখে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল আর নবীপাক তার সাথে কী যেন বললেন। কথা শেষে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, উটটি এসে আমাকে অভিযোগ করল তার মালিক উটটিকে জবেহ্ করতে চাই তাই সে আমার কাছে এসে অভিযোগটি পেশ করল। এ বলে নবীজি উটের মালিককে ডেকে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলে মালিক সত্যি সত্যিই স্বীকার করলেন, হ্যাঁ আমি আমার পিতার ভোজ যিয়াফতের জন্য উটটি জবেহ করতে চায়। রাসূলে পাক তাকে বললেন উট যেহেতু আমার কাছে প্রাণের ভিক্ষা চেয়েছে সুতরাং তুমি উটটিকে জবেহ করিও না। মালিক নির্দেশ মেনে উট নিয়ে বিদায় নিল।

অনূরূপ হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আবূ হোরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র দুই বর্ণনায় রয়েছে উট এসে নবী করীম কদমে সাজদা করেছিল। অপর বর্ণনায় রয়েছে উট নবীজির কদমে সাজদাহ্ করতে দেখে সাহাবীদের কেউ কেউ আবেদন করলেন, ''এয়া রাসূলাল্লাহ! উটের মত চতুস্পদ জন্তু যদি আপনার কদমে সাজদাহ্ করতে পারে তাহলে আমরাও কি পারি না?'' উত্তরে নবী করীম বললেন, ''আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদাহ্ করার অনুমতি যদি আমি দিতাম তাহলে মহিলাদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদেরকে সাজদা করতে। ইসলামী শরীয়ত মতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদাহ্ করা হারাম।

সমস্ত জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল

وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَآءَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّبْتَغِىْ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ لَهٗ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَآئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضَآءً لِّطَالِبِ الْعِلْمِ ـ وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِى الْمَآءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلٰى سَآئِرِ الْكَوْكَبِ وَاِنَّ الْعُلَمَآءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَآءِ اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَادِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَ بِهٖ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ـ

অনুবাদ

হযরত আবুদ্ দারদা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেউ (দ্বীনী) ইল্‌ম অর্জনের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হলে আল্লাহ্ পাক তাঁকে বেহেশ্‌তের রাস্তায় পরিচালিত করেন এবং ফেরেশ্‌তারা (দ্বীনী) ইল্‌ম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁদের পায়ের নিচে নূরানী ডানাসমূহ বিছিয়ে দেন। আলিমদের জন্য গুনাহ্ মাফ চাইতে থাকে দুনিয়ায় যা কিছু আছে এবং আসমানে যা কিছু রয়েছে এমনকি সমুদ্রের মাছগুলো পর্যন্ত। আলিমের মর্যাদা আবিদ (সাধারণ ইবাদতকারী)-এর উপর আকাশের অসংখ্য জ্বলন্ত নক্ষত্রের মাঝে উজ্জ্বল চন্দ্রের মর্যাদার মত। নিশ্চয় আলিমগণ নবীদের ওয়ারিশ। কেননা নবীগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যান নি, বরং তাঁরা যা রেখে গেছেন তা হল ইল্‌ম। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল সে অনেক বড় কিছু অর্জন করল।

[তিরমিযী শরীফ : কিতাবুল ইল্‌ম, মুসনাদে আবী হানীফা, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্, তাবরানী, বায়হাক্বী, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব'র বরাতে মিশকাত শরীফ ৩৪ পৃষ্ঠা]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জ্ঞান মানুষকে আলোকিত করে; অবশ্য তা যদি দ্বীনী জ্ঞান হয়। পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ''তারা (উভয়) কি সমান, যারা জানে এবং যারা

জানে না?'' নিশ্চয় না। দ্বীনী জ্ঞান এমন একটি নি'মাত; যারা এ নি'মাত পেয়ে ধন্য তারা দুনিয়ার অন্য সকল মানুষের চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টমণ্ডিত।

দ্বীনী জ্ঞানার্জনকারীগণ বেহেশ্‌তের রাস্তার পথচারী

দুনিয়াতে লোকেরা বিভিন্ন চাহিদা নিয়ে ঘুরাফিরা করে। মূলত যে যা তালাশ করে এক পর্যায়ে সে তা পেয়ে যায়। যেমন সহীহ বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসে রয়েছে, যারা দুনিয়া অর্জনের জন্য হিজরত করে তারা দুনিয়া পায়, আর যারা আল্লাহ্-রসূলের নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে বের হয়, তারা আল্লাহ্-রসূলকে পেয়ে যায়। তদ্রুপ যারা দ্বীনী ইল্‌ম অর্জনের রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য বেহেশ্‌ত পাওয়ার রাস্তাও সহজ করে দেন। এক কথায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই যদি হয়ে থাকে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র লক্ষ্য, তাহলে সে বান্দার বেহেশ্‌তের জিম্মাদারী স্বয়ং আল্লাহ্ই গ্রহণ করে নেন। হাদীসের ভাষ্যমতে অনুমেয় যে, আমাদের জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত।

ফেরেশতাদের দো'আ

ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ। এদের কাজই হল আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা। যিক্‌র-আয্‌কার করা এবং মানুষের জন্য দো'আ করা। জ্ঞান অর্জনকারী লোকদের জন্য নিষ্পাপ ফেরেশ্‌তারা তাদের নূরানী ডানাসমূহ বিছিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হন না; বরং রব্বুল আলামীনের মহান দরবারে প্রাণভরে দো'আ করেন। শুধু তাই নয়, বরং আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে এমনকি সাগরের মাছ পর্যন্ত দ্বীনী জ্ঞানার্জনকারীর জন্য দো'আ করতে থাকে।

জ্ঞানীর মর্যাদা

সাধারণ ইবাদতকারী সারা রাত ধরে ইবাদত করেও যা অর্জন করতে পারেনা একজন আলিম-ই বা'আমল সারারাত ঘুমিয়েও তার চেয়েও বেশি সাওয়াব অর্জন করতে পারে। কারণ সাধারণ ইবাদতকারীর ইবাদতে অনেক ভুল থাকার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু আলিমের ঘুমও ইবাদত। কারণ তা নবীপাকের তরীক্বামতে হয়। আর সাধারণ ইবাদতকারীর ইবাদতের মধ্যে শয়তান বিভিন্ন প্রকারের কুমন্ত্রণা দেয়ার সুযোগ খুঁজে, কিন্তু ইলমে দ্বীনের ধারক আমলসম্পন্ন আলিমের পাশে যেতেও শয়তান অনেক সময় ভয় করে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণিত হাদীসে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- ''একজন ফক্বীহ্ (দ্বীনী জ্ঞানের অধিক বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি) শয়তানের জন্য এক হাজার সাধারণ ইবাদতকারীর

চেয়েও শক্তিশালী।'' অন্য হাদীসে রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর একটা ভিত্তি থাকে, আর এ ধর্মের ভিত্তি হল 'ইল্ম-এ দ্বীন'। [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ইত্যাদি]

আকাশের বুকে লক্ষ-কোটি তারকার মাঝে জ্বলন্ত চাঁদের আকর্ষণ যেমন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, তেমনি অন্যান্য আবিদের সামনে জ্ঞানীর অবস্থান স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। অপর হাদীসে রয়েছে- হযরত আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস শরীফে রসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- ''পৃথিবীতে আলিমের মর্যাদা ওই নক্ষত্রের মত, যা দেখে রাতের অন্ধকারে জল-স্থলের পথিক পথের সন্ধান পেয়ে থাকে। যদি সেই নক্ষত্র ডুবে যায়, তাহলে চলন্ত পথিক দিকভ্রান্ত হয়ে যায়।'' অর্থাৎ ওলামা-ই কেরামের অভাবে সাধারণ লোক পথহারা হবেই।

ইল্ম নবীগণের মীরাস

মানুষ মারা যাওয়ার পর তার রেখে যাওয়া পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করা হয়। কিন্তু নবীগণের সম্পত্তির কোন ওয়ারিশ নেই। তাদের মীরাস হল 'ইলমে দ্বীন' তথা ধর্মীয় জ্ঞান। তাই নবী করীম এরশাদ করতেন **نَحْنُ مَعْشَرُالْاَنْبِيَاءِ لَانُوْرِثُ وَلَانُوْرَثُ** অর্থাৎ ''আমরা নবীগণের দল, আমরা কাউকে সম্পত্তির ওয়ারিশ করিনা এবং কেউ আমাদেরকেও ওয়ারিশ করেনা।'' পৃথিবীতে তাঁরা যা বন্টন করেছেন তাহল শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান। আর সমস্ত নবী-রসূলের জ্ঞানের মূল উৎস হল আমাদের আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তাই আল্লামা বূসীরী আলায়হির রাহ্মাহ্ চমৎকার বলেছেন-

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِکَ الدُّنْيَا وَ ضَرَّتَهَا
وَمِنْ عُلُوْمِکَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَم

অর্থাৎ হে রসূল! দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত নি'মাত আপনারই দান। আর লওহ-কলমের জ্ঞানরাশি আপনার জ্ঞানরাশি হতেই প্রাপ্ত।

--><--

ইলমে গায়্ব নবী করীমের নুবূয়তের অন্যতম দলীল

بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِA الْفَجْرَوَصَعِدَالْمِنْبَرْ فَخَطَبَنَا حَتّٰى حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرفَخَطَبَنَا حَتّٰى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرفَخَطَبَنَا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَآئِنٌ قَالَ فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا –

অনুবাদ

হযরত আমর ইবনে আখতাব রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। অতঃপর মিম্বরে আরোহন করলেন এবং আমাদের উদ্দেশে দীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করলেন; এমনকি যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল; সুতরাং তিনি মিম্বর হতে নেমে এসে যোহরের নামায পড়ালেন। অতঃপর আবারো আরোহন করলেন মিম্বরে, আর বক্তব্য দেয়া শুরু করলেন, এমনকি আসরের নামাযের সময় উপস্থিত হল। অতঃপর মিম্বর হতে নেমে আসরও পড়লেন, পুণরায় মিম্বরে আরোহন করে বক্তব্য দিতে দিতে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। সেদিন নবী করীম অতীতে যা কিছু ছিল এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হবে সকল বিষয়ে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যাঁদের স্মরণশক্তি অধিক তাঁরা সেসব (অদৃশ্য) সংবাদ বেশি মনে রাখতে পেরেছেন।

[**সূত্র :** বুখারী শরীফ হাদীস নম্বর ৬২৩০ কিতাবুল কদর, মুসলিম শরীফ হাদীস নম্বর ২৮৯১ কিতাবুল ফিতান, তিরমিযী শরীফ হাদীস নম্বর ২১৯১ কিতাবুল ফিতান, আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নম্বর ৪২৪ কিতাবুল ফিতান, মিশকাতুল মাসাবীহ : কিতাবুল ফিতান : ৪৬১পৃষ্ঠা]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মহান রব্বুল আলামীন পৃথিবীর বুকে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যত নবী-রসূল পাঠিয়েছেন সবাইকে তাঁদের নুবূয়তের দলিল হিসেবে কতিপয় মু'জিযাও দান করেছেন।

অন্যান্য নবীগণের ক্ষেত্রে ওইসব মু'জিযার সংখ্যা সীমিত থাকলেও আমাদের প্রিয়রসূল সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্য নবীগণের যাবতীয় মু'জিযা একত্রিত করলে যা হয়, তার সবক'টি তো বটে; বরং এরপরেও আরো কত মু'জিযা দান করেছেন তা

গণনা করা যাবে এমন হিসেবের খাতা নীল আকাশের নিচে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। গণনার বাইরে যেসব মু'জিযা রয়েছে এর একটি হল ইলমে গায়্ব বা অদৃশ্যজ্ঞান। এই ইল্মে গায়্ব মহানবীর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম আর মহান আল্লাহর অনুগ্রহ। যেমন- কোরআনে পাকে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন-

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

অর্থাৎ: আপনার যা জানা ছিল না তিনি আপনাকে সবই শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা ছিল আপনার উপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ।

পবিত্র ক্বোরআনের ভাষায় বলা যায়- নবীপাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জন্য মহান আল্লাহ্ অজানা কিছুই রাখেননি; হোকনা তা অতীত কিংবা ভবিষ্যত। ক্বিয়ামত পরবর্তী বেহেশ্ত-দোযখের সংবাদ পর্যন্ত যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারেনি। তাইতো তিনি উপস্থিত অনেক লোকের মনের খবর বলে দিয়েছেন, মুনাফিক্বদের অন্তরে আবৃত অন্ধকার কুঠুরিতে লালিত কপটতা প্রকাশ করে মসজিদ থেকে তাদের অনেককে বের করে দিয়েছেন। এমন কি অনেক সাহাবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বংশ তালিকা নিখুঁতভাবে বলে দিয়েছেন এগুলো কি প্রমাণ করেনা নবীপাকের ইলমে গায়্ব বিতর্কের ঊর্ধ্বে একটি স্বীকৃত বিষয়?

আল্লাহর রসূলের বাল্যবন্ধু নয় কেবল সারাজীবনের একান্ত সঙ্গী ইসলামের প্রথম খলীফা এবং নবীগণের পর যিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ, সিদ্দীক্ব-ই আকবর হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে নবী করীমের কাছে তাঁর নুবূয়তের পক্ষে দলীল কী আছে জানতে চাইলে নবী করীম উত্তর দিতে গিয়ে ভ্রূ কুঁচকে ফেলেন নি বরং দু'শ ভাগ দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে বলে দিয়েছিলেন কেন গত রাতে তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ, আকাশের চন্দ্র-সূর্য তোমার কোলে এসে হাজির। আর সিরিয়া যাত্রাপথের সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী তোমাকে যা কিছু বলেছে তাইতো আমার নুবূয়তের পক্ষে দলীল। এমন আশ্চর্যজনক তথ্যপ্রদানের অবস্থা হচ্ছে সিদ্দীক্ব-ই আকবর একেবারে স্তম্ভিত! তিনি শতভাগ নিশ্চিত হলেন যে, এই অদৃশ্যজ্ঞানের সংবাদদাতা (নবী) কষ্মিণকালেও মিথ্যুক হতে হতে পারেন না। তিনিই মহান আল্লাহর সত্য নবী। সন্দেহাতীতভাবে তাঁর নবূয়ত প্রমাণিত।

তদ্রূপ হযরত আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কথা শোনা যাক। বদরের যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ হলে অন্য বন্দীরা যথারীতি মুক্তিপণ আদায়ে ব্যস্ত। এদিকে হুযূরের চাচা হযরত আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুও

ওই যুদ্ধবন্দীদের একজন। তিনি ভাতিজার কাছে এসে আবেদন করলেন, বাবা! আমিতো গরীব মানুষ। মুক্তিপণ দেয়ার মত আমার কাছে কোন সম্পদ নেই। উত্তরে নবী করীম বললেন, ''কেন চাচা! আপনি যুদ্ধে আসার পূর্বে আমার চাচীর কাছে যে স্বর্ণালঙ্কার লুকিয়ে রেখে এসেছেন সেগুলো কোথায়? হযরত আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সে গোপন সংবাদ তো দুনিয়ার বুকে অন্য কেউ জানার কথা নয়। কিন্তু তাঁর ভাতিজা কীভাবে সুস্পষ্টভাবে বলে দিলেন, তা রীতিমত বিষ্ময়ের! না! এ ধরনের অদৃশ্য সংবাদদাতা কোনদিন মিথ্যুক হতে পারেন না। তাঁর কপালও চমকে উঠল। নবীজির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলে উঠলেন হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ইসলামের কালেমা শরীফ পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে দিন। আমি এতদিন ছিলাম গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। এবার আলোতে আসতে চাই। নবীজি তাঁকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানালেন। এভাবে একজন জাহান্নামী মুহূর্তে বেহেশতী হয়ে গেলেন। শুধু কি তাই? নবীর পরশে শ্রেষ্ঠ সোনার মানুষে রূপান্তরিত হলেন।

এভাবে হাজারো দৃষ্টান্ত রয়েছে যদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়- মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে ইলমে গায়্ব দান করেছেন।

এখন আমরা আরো কয়েকটি সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করব যাতে সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কিছু মানিনা বলে যারা গলার পানি শুকিয়ে ফেলে তারাও বিষয়টি সহজে বুঝতে পেরে হিদায়াত লাভ করে।

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُوْلُ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ مَقَامًا فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

অর্থাৎ হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে দণ্ডায়মান হলেন অতঃপর সৃষ্টিজগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তথা বেহেশ্তবাসীরা বেহেশ্তে এবং দোযখবাসীরা দোযখে প্রবেশ করা পর্যন্ত সবকিছু আমাদের সামনে বলে দিলেন। আমাদের মধ্যে যারা মুখস্থ রাখতে পেরেছে তারা মুখস্থ রেখেছে; আর যারা ভুলে যাবার তারা ভুলে গেছে। [বুখারী: হা.নং ৩০২০ : কিতাবু বাদয়িল খালক্ব]

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَامًا مَاتَرَكَ شَيْئًا يَّكُوْنُ فِيْ مَقَامِهٖ ذٰلِكَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّا حَدَّثَ بِهٖ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ: হযরত হুযাইফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলে পাক

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন- সেদিন থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার কোন বিষয়ই তাঁর বক্তব্যে বাদ দেননি। শ্রোতাদের মধ্যে যে মুখস্থ রাখার সে মুখস্থ রেখেছে, আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে।

[সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬২৩০ কিতাবুল কদর, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৮৯১ কিতাবুল ফিতন]

হযরত আনাস বিন মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত অপর এক হাদীস শরীফে দেখা যায়, তিনি বলেন- একদা নবীপাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে তাশরীফ আনলেন তখন সূর্য পশ্চিমাকাশের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল (অর্থাৎ যোহরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল), অতঃপর নবী করীম যোহরের নামায পড়লেন আর সালাম ফিরানোর পর মিম্বরে আরোহন করে ক্বিয়ামতের আলোচনা রাখলেন এবং ক্বিয়ামতের পূর্বেকার কতিপয় বড় বড় ঘটনার বর্ণনা দিলেন আর উপস্থিত সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন- কারো কোন বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকলে সে যেন প্রশ্ন করে। তিনি আরো বলেন, খোদার কসম! তোমরা আমার কাছে যা কিছু জানতে চাইবে আমি এই মজলিসেই সব প্রশ্নের উত্তর দেব।

হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুযূরের বাণীর এমন দৃঢ়তা দেখে আনসারী সাহাবীদের মধ্যে আনন্দের কান্নার রোল বয়ে গেলো। আর নবীপাক বারবার বলে যাচ্ছেন- তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর, প্রশ্ন কর। অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল- হে আল্লাহর রসূল! পরকালে আমার ঠিকানা কোথায় হবে? নবীপাক বললেন, জাহান্নাম। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা বললেন- এয়া রসূলাল্লাহ্! আমার পিতা কে? নবী করীম বললেন- তোমার পিতা হুযাফা। নবীপাক আবারও জোর তাকীদ দিয়ে বললেন, তোমরা প্রশ্ন কর, প্রশ্ন কর। অতঃপর ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম বরাবর সামনে গিয়ে বসলেন আর বললেন- আমরা সন্তুষ্ট আল্লাহ্কে রব হিসেবে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে রসূল হিসেবে পেয়ে। তিনি এসব কথা বলার সময় নবী করীম চুপ রইলেন। অতঃপর বললেন- সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমার এ দেয়ালের সামনে এইমাত্র বেহেশ্ত ও দোযখ হাজির করা হয়েছে, যখন আমি নামায পড়ছিলাম, আজকের মত কোন ভাল-মন্দকেও দেখিনি।

[সূত্র: বুখারী শরীফ: হাদীস নং ৬৮৬৪: কিতাবুল ই'তিসাম্ বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ্, মুসলিম শরীফ : হাদীস নং ২৩৫৯]

এভাবে অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়ব'র অধিকারী ছিলেন। অবশ্যই তা আল্লাহ্ প্রদত্ত।

আর সত্তাগত আলিমুল গায়ব হলেন একমাত্র আল্লাহ্। আর আল্লাহ্র রসূলের ইল্মে গায়ব আল্লাহ্প্রদত্ত। যেমন এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

অর্থাৎ: হে সাধারণ লোকগণ! আল্লাহ্ তা'আলার শান নয় যে, তিনি তোমাদেরকে ইল্মে গায়ব দান করবেন, তবে হ্যাঁ রসূলগণের মধ্য হতে তিনি যাকে চান তাকে অদৃশ্যজ্ঞানের জন্য মনোনীত করেন।

রসূলগণের মধ্য হতে যদি আল্লাহ্ পাক কাউকে নির্বাচিত করেন, তাহলে সর্বপ্রথমে কাকে নির্বাচিত করবেন তা সহজেই অনুমেয়।

মূলত গবেষণা করলে দেখা যায়, নবীজীর বরকতময় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে রয়েছে বিশ্বমানবতার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। আর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে দেখা যায়, ইলমে গায়বের প্রভাব। পবিত্র ক্বোরআন-হাদীসের আলোতে সংক্ষেপে এতটুকু আলোচনা করলাম। বিস্তারিত জানার জন্য দেখতে পারেন জা-'আল হক্ব : প্রথম খণ্ড।

--><--

হায়াতুন্ নবী

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِىُّ اللّٰهِ حَىٌّ يُرْزَقُ.

رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَة

অনুবাদ

হযরত আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক নবীগণের দেহ মুবারক খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌র নবী জীবিত ও রিয্‌ক্ব দেওয়া হয়। -[সূত্র: ইবনে মাজাহ্ শরীফের সূত্রে মিশকাত শরীফ ১২১ পৃষ্ঠা]

হাদীস বর্ণনাকারীর পরিচিতি

নাম: ওয়াইমার ইবনে যায়দ, উপনাম: আবূ দারদা, পিতার নাম: আবদুল্লাহ্। হাকীমুল উম্মত হিসেবে তিনি সবার কাছে পরিচিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কাছে পবিত্র ক্বোরআনুল করীম পড়ে হাফিযে ক্বোরআন হয়েছিলেন। পরবর্তীতে সিরিয়াবাসী মুসলমানদেরকে তিনি ক্বোরআন শিক্ষা দেন এবং সেখানকার ফক্বীহ ও ক্বাযী নিযুক্ত হন। হযরত আবূ ইদরীস খাওলানী, খালিদ ইবনে মি'দান, সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, আলক্বামা, যুবাইর ইবনে নুফাইর, উম্মে দারদা এবং স্বীয় পুত্র বেলালসহ অনেকেই তাঁর কাছে হাদীস শরীফ শিক্ষা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস শরীফের সংখ্যা ১৭৯ খানা। আল্লাহ্‌র রসূল তাঁকে হযরত সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। হুযূরের ওফাত শরীফের সময় যে চারজন সাহাবী-এ রসূল পূর্ণাঙ্গ হাফিযে ক্বোরআন ছিলেন তন্মধ্যে হযরত আবূ দারদা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অন্যতম। অবশিষ্ট তিনজন ছিলেন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল, হযরত যায়দ ইবনে সাবিত এবং হযরত আবূ যায়দ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এ সাহাবী হযরত আবূ দারদা হিজরি ৩২ সন মোতাবেক ৬৫২ সালের ৯ নভেম্বর দামেস্কে ইন্তিকাল করেন। -[তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায]

হাদীসের প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের আক্বীদা হল আল্লাহ্‌র নবীগণ স্ব স্ব রওযা শরীফে জীবিত এবং সক্রীয় আছেন। বাতিলপন্থী কিছু লোকের আক্বীদা ও বিশ্বাস- 'নবীগণ মরে মাটির সাথে মিশে গেছেন' (না'ঊযু বিল্লাহ্)। এ ধরনের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদা অন্তরে লালন করে সাধারণ মানুষকে ঈমান ও আমলের দাওয়াত দিতে দেখে সচেতন মহলের নিশ্চয়ই হাসি পায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এদের বিভ্রান্তির জালে আটকা পড়ে যাচ্ছে সরলমনা কিছু মানুষ। তাই সরলমনা মুসলমানদের ঈমানকে হিফাযতের লক্ষ্যে ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামের মৌলিক আক্বীদাগুলো উপস্থাপন করা আমাদের দায়িত্ব। বাতিলপন্থীরা হায়াতুন্নবীর (নবীর জীবন) মত ক্বোরআন-হাদীস সমর্থিত একটি আক্বীদাকে ইতোমধ্যে বিতর্কিত বানিয়ে ফেলার অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য হাদীস শরীফ এবং যুগবরেণ্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম বিষয়টিকে কীভাবে মূল্যায়ন করে এসেছেন, আসুন আমরা তা আলোচনা করি।

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন

پیغمبر خدا زنده است به حقیقت حیات دنیاوی یعنی خدائے تعالی کے نبی دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زنده ہیں۔ اشعّة اللمعات : صفحہ ٥٧٦ جلد ١

অর্থাৎ নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম জাগতিক জীবন নিয়ে জীবিত, অর্থাৎ দুনিয়াবী জীবনসত্তা নিয়েই তাঁরা সক্রিয়। -[আশি''আতুল লুম'আত : ১ম খণ্ড : ৫৭৬ পৃষ্ঠা]

হযরত আল্লামা মোল্লা 'আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি উক্ত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন:

لَافَرْقَ لَهُمْ فِى حَالَتَيْنِ وَلِذَا قِيْلَ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ لَايَمُوْتُوْنَ وَلٰكِنَّ يَنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ.

অর্থাৎ জীবন-মৃত্যু উভয় অবস্থার মধ্যে তাঁদের জন্য কোন পার্থক্য নেই। এ জন্যই বলা হয়- আল্লাহ্‌র ওলীগণ মৃত্যুবরণ করেন না, কেবল এ জগত হতে ওই জগতে স্থানান্তরিত হন মাত্র। -['মিরক্বাত' ২য় খণ্ড ১১২ পৃষ্ঠা, মুম্বাই, ভারত]

আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফে রয়েছে

عَنْ اَوْسِ ابْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ- হযরত আউস ইবনে আউস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা যমীনের উপর নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর দেহ মুবারক (ভক্ষণ করা) হারাম করে দিয়েছেন। -[আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফের সূত্রে মিশকাত ১২০ পৃষ্ঠা]

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি উক্ত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ اَحْيَآءٌ

অর্থাৎ- নবীগণ স্ব স্ব রওযা শরীফে জীবিত।

হযরত আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, আম্বিয়া-ই কেরাম জীবিত। এটাই সর্বজন গ্রহণযোগ্য অভিমত। এতে কারো দ্বিমত নেই। তাঁদের হায়াত মুবারক জাগতিক এবং দৈহিক; শহীদগণের মতো কেবল রূহানী বা আত্মিক নয় (বরং আরো উন্নত)।

যৌক্তিক প্রমাণ

তাই তো মি'রাজ রজনীতে আমাদের প্রাণপ্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মুক্বাদ্দাস পৌঁছে নবীগণকে নিয়ে নামায আদায় করেছেন। নবীগণ যদি ইন্তিক্বালের পর জীবিত না হতেন তবে কিভাবে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে নামায আদায় করলেন।

নবীগণ দৈহিকভাবে জীবিত। আর এ জন্য তাঁদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বন্টন করা যায় না এবং তাঁদের স্ত্রীগণকেও অন্য কারো জন্য বিয়ে করার অনুমতি নেই।

তাছাড়া, নবী-রসূলগণের জীবন-মৃত্যুর মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য হল- সাধারণ লোকের চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা ও অন্তর দিয়ে বুঝা যায় না। যেমন মারাক্বিউল ফালাহ্ কিতাবের রয়েছে:

وَمِمَّا هُوَ مَقَرَّرٌعِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ اَنَّهُ ﷺ حَىٌّ يُرْزَقُ مُمَتَّعٌ بِجَمِيْعِ الْمَلَاذِ وَالْعِبَادَاتِ غَيْرَ اَنَّهُ حَجَبٌ عَنْ اَبْصَارِ الْقَاصِرِيْنَ عَنْ شَرِيْفِ الْمَقَامِ. (طحطاوى على مراقى الفلاح)

অর্থাৎ- অভিজ্ঞ ওলামা-ই কেরামের দৃষ্টিতে এ কথা প্রমাণিত যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জাগতিক জীবন নিয়ে জীবিত। তাঁর কাছে রিযক্ব পেশ করা হয়। তিনি সমস্ত সুস্বাদু খাবার এবং ইবাদতের স্বাদ অনুভব করেন। কিন্তু যে সমস্ত লোক উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন নি, তাদের

দৃষ্টি নবী-ই আকরামের অবস্থা দর্শন হতে বঞ্চিত। তাহতাভী: মারাক্বিউল ফালাহ: ৪৪৭ পৃষ্ঠা

নাসীমুর রিয়াজ শরহে শেফা কাজী আয়াজ কিতাবে রয়েছে:

اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَآءٌ فِىْ قُبُوْرِهِمْ حَيَاةً حَقِيْقَةً

অর্থাৎ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) প্রকৃত জীবন নিয়ে স্ব স্ব কবরসমূহে জীবিত।

['নাসীমুর রিয়ায' ১ম খন্ড ১৯৬ পৃষ্ঠা]

মিরক্বাত শরহে মিশকাত ১ম খন্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

اِنَّهُ ﷺ حَىٌّ يُرْزَقُ وَلِيُسْتَمَدُّ مِنْهُ الْمَدَدَ الْمُطْلَقُ

অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জীবিত, তাঁকে রিযক্ব প্রদান করা হয় এবং তাঁর কাছে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা করা যায়।

ইমাম আবূ ইয়া'লা রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি স্বীয় মুসনাদে এবং ইমাম বায়হাক্বী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'হায়াতুল আম্বিয়া' কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন-

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِىْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ

অর্থাৎ হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নিশ্চয় নবীপাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''নবীগণ স্ব স্ব কবর শরীফে জীবিত এবং তাঁরা নামায পড়েন।''

উল্লেখিত দলীলাদির আলোকে যেখানে প্রমাণিত হল যে, সমস্ত নবী আপন আপন রওযা শরীফে জীবিত, সেক্ষেত্রে নবীকুল সর্দার, যাঁর ওসীলায় কুল কা-ইনাত সৃষ্টি করা হয়েছে, ওই মহান রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে স্বীয় রওযা মুবারকে সশরীরে জীবিত, তা প্রশ্নের অবকাশ রাখে না। একজন ঈমানদারের আক্বীদা-বিশ্বাস থাকতে হবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রওযা মুবারকে শুধু জীবিতই নন; বরং সমগ্র জগত তাঁর ওসীলায় এখনও জীবিত, চলমান ও সক্রিয়। যেমন পবিত্র ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে-

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٧

অর্থাৎ: ''আমি আপনাকে জগতসমূহের জন্য রহমত করেই প্রেরণ করেছি।''

-[সূরা আম্বিয়া-১০৭ আয়াত]

মূলতঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন সমগ্র জগতের প্রাণ ও চালিকাশক্তি। তিনি যদি মৃত হতেন তাহলে জগতের অস্তিত্ব নিমিষেই বিলীন

হয়ে যেত। এ আলোচনায় উল্লিখিত কয়েকটা দলীল ছাড়াও হায়াতুন্নবী বিষয়ে আরো অসংখ্য দলীল রয়েছে এমনকি এ বিষয়ে বহু প্রামাণ্য কিতাবও রচিত হয়েছে। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা গেল:

১. জামে'উল ওয়াসা-ইল, ২. আম্বাউল আযকিয়া বি হায়াতিল আম্বিয়া, কৃত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী ৩. ফুয়ূজুল হারামাঈন, কৃত হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী, ৪. আল্ মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়া, ৫. তাফসীরে মাযহারী, কৃত. আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী, ৬. যারক্বানী আলাল মাওয়াহিব, ৭. আখ্বারুল আখ্য়ার, কৃত আল্লামা শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী ৮. তাফসীরে রূহুল বায়ান, কৃত আল্লামা ইসমাঈল হক্কি ৯. মসনবী শরীফ, কৃত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী, ১০. হাদাইক্বে বখশিশ, কৃত. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা এবং ১১. মাক্কালাতে কাযেমী কৃত গায্যালিয়ে যামান আল্লামা আহমদ সাঈদ কাযেমী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম।

--><--

মক্বামে মাহমূদ

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَكُوْنُ اَنَا وَاُمَّتِىْ عَلٰى تَلٍّ وَيَكْسُوْنِىْ رَبِّىْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى حُلَّةً خَضْرَآءَ ثُمَّ يُؤْذَنُ لِىْ فَاَقُوْلُ مَاشَآءَ اللّٰهُ اَنْ اَقُوْلَ فَذٰلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ .

অনুবাদঃ হযরত কা'ব ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ক্বিয়ামত দিবসে সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে। আমি আমার উম্মতকে নিয়ে এক টিলার উপর অবস্থান করব। আমাকে আমার রব সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। অতঃপর আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আল্লাহর মর্জি মোতাবেক আমি আরয করব এবং সেটিই 'মক্বামে মাহমূদ'।

-সহীহ ইবনে হিব্বান : হাদীস নম্বর- ৬৪৭৯, মুসনাদে ইমাম আহমদ : হাদীস নম্বর- ৪৫৪৬, মুসতাদরাকে হাকেম : হাদীস নম্বর- ৩৩৮৩, মু'জামুল কবীর : হাদীস নম্বর -১৪২

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মক্বামে মাহমূদ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা ক্বিয়ামত দিবসে প্রকাশিত হবে। আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন এই আসনে আমাদের প্রিয় নবীজী ব্যতীত অন্য কাউকে সমাসীন করবেন না। যেমন পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-**عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا** অর্থাৎ নিশ্চয় আপনার রব আপনাকে মক্বামে মাহমূদে সমাসীন করবেন। -সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৯ আয়াত

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন- ক্বিয়ামত দিবসে মানুষেরা যখন দিক- বিদিক ছুটাছুটি করবে। প্রতিটি উম্মত আপন নবীর কাছে গিয়ে শাফা'আতের আবেদন করবে। সর্বশেষ শাফা'আত মিলবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে এবং এটাই সেদিন, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবীকে মক্বামে মাহমূদে সমাসীন করবেন।-বুখারী শরীফ : ২য় খণ্ড : পৃষ্ঠা-৬৮৬, নাসাঈ শরীফ, কুরতবী, তাফসীরে ইবনে কাসীর

ইত্যাদি

হযরত আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুজূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ক্বিয়ামত দিবসে মানুষ সমুদ্রের হিল্লোলের মত এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করবে। এক পর্যায়ে তারা হযরত আদম আলায়হিস সালাম-এর কাছে গিয়ে বলবে আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের দরবারে শাফা'আত করুন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম-এর কাছে যাও, যেহেতু তিনি খলীলুল্লাহ বা আল্লাহর ঘনিষ্ট বন্ধু। অতঃপর তারা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম-এর কাছে যাবে। তখন ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম বলবেন, আমি এ কাজের জন্য নই। বরং তোমরা মূসা আলায়হিস সালাম-এর নিকটে যাও। কেননা তিনি কালীমুল্লাহ। অতঃপর লোকেরা হযরত মূসা আলায়হিস সালাম-এর কাছে গিয়ে শাফা'আতের আবেদন করলে তিনিও বলবেন এ কাজের জন্য আমি নই। তোমরা হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম -এর কাছে যাও। কেননা তিনি রূহুল্লাহ্ এবং কালিমাতুল্লাহ। তাঁর কথামত লোকেরা হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম-এর কাছে গিয়ে আবেদন করবে। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামও জবাবে বলবেন আমি এ কাজের জন্য নই। সুতরাং তোমরা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে যাও। অতঃপর লোকেরা আমার কাছে আসবে, আর তখনই আমি বলে উঠব- হ্যাঁ, আমিই সেই শাফা'আতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। শাফা'আত করা আমারই কাজ। অতঃপর আমি আমার রবের কাছে শাফা'আতের অনুমতি প্রার্থনা করব আর তখনই আমার জন্য শাফা'আতের অনুমতি মিলে যাবে।....এক পর্যায়ে আমি আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে সাজদায় অবনত হয়ে পড়ব। তখন আল্লাহ্ পাক আমাকে ডাক দিয়ে বলবেন- হে আমার হাবীব! আপনি মাথা উত্তোলন করুন, আপনি বলুন! আপনার কথা শুনা হবে, আপনি আবেদন করুন, আপনার আবেদন মনজুর করা হবে, আপনি শাফা'আত করুন আপনার শাফা'আত ক্বুবূল করা হবে।

হযরত আউফ ইবনে মালেক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- আল্লাহ্ পাক আমার কাছে একটা পয়গাম পাঠিয়ে সুসংবাদ স্বরূপ দু'টি প্রস্তাব দিলেন এক আল্লাহ্ আমার অর্ধেক উম্মতকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন অথবা আমাকে শাফা'আতের ক্ষমতা দান করবেন। আমি শাফা'আতের মালিকানা গ্রহণ করলাম। কেননা আমি তা দ্বারা শির্ককারী ব্যতীত সকল মুসলমানের

শাফা'আত করব।

-তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, তাবরানী ইত্যাদি

অপর বর্ণনায় রয়েছে, হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- প্রত্যেক নবীর জন্য একেকটা মাক্ববূল দো'আ রয়েছে, যা তারা করে ফেলেছেন, কিন্তু আমি চাই আমার দো'আ ক্বিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্য রেখে দেই। -[বুখারী শরীফ : কিতাবুদ দা'ওয়াত]

হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আবেদন করলাম। নবী করীম যেন আমার জন্য ক্বিয়ামত দিবসে শাফা'আত করেন। উত্তরে নবী করীম এরশাদ করলেন- হ্যাঁ, অবশ্যই আমি শাফা'আত করব। আমি আরয করলাম- এয়া রসূলাল্লাহ্! আমি সেদিন আপনাকে কোথায় তালাশ করব? নবী করীম বললেন, তুমি প্রথমে আমাকে তালাশ করবে- পুলসেরাতের গোড়ায়। আমি বললাম- সেখানে না পেলে? তিনি বললেন- তাহলে মীযানের কাছে। আমি বললাম- এয়া রসূলাল্লাহ্! সেখানেও যদি আপনাকে না পাই তাহলে কোথায় তালাশ করব? হুযূর এরশাদ করলেন- তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে হাউযে কাউসারের সামনে পেয়ে যাবে। কেননা, আমি সেদিন এই তিনটি জায়গা ব্যতীত অন্য কোথাও যাব না।

[সূত্রঃ তিরমিযী শরীফ : কিতাবু সেফাতিল ক্বিয়ামাহ্, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল : হাদীস নম্বর-১২৮৪৮ ফতহুল বারী : ৮ম খণ্ড : পৃষ্ঠা-৪৬৬, তারিখে কবীর : ৮ম খণ্ড : পৃষ্ঠা-৪৫৩]

মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেছেন- শাফা'আতে কুবরার ক্ষমতা প্রদানের নামই হল 'মক্বামে মাহমূদ'। যেমন পবিত্র হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায়ও অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত- রসূলে মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম**عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا**এর ব্যাখ্যায় এরশাদ করেন শাফা'আতে 'ওয্মা (বৃহত্তম সুপরিশ)-এর নামই হল 'মাক্বামে মাহমূদ'।

ইমাম ইবনে জাওযী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীস বর্ণনা করেন- "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আরশের উপর বসাবেন।" ইমাম ইবনে জাওযী আরো লিখেন- 'মক্বামে মাহমূদ' অর্থ কী? তার উত্তরে বলা যাবে- "ক্বিয়ামত দিবসে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ আরশের উপর বসাবেন এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর

তাঁর উন্নত মর্যাদার চর্চা করা হবে।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন- "আল্লাহর দরবারে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এমন একটা অবস্থান রয়েছে, যে স্থানে অন্য কোন নবী-রসূল পৌঁছতে পারেনা এবং কোন ফেরেশতাও না। সেই আসনে বসিয়ে মহান আল্লাহ্ আমাদের প্রিয়নবীকে অন্যান্য পূর্বাপর সকল সৃষ্টির উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন। এককথায় মক্বামে মাহমূদ একমাত্র আমাদের প্রিয় রসূলের জন্যই খাস।"

হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম এরশাদ করেন- "আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যত আমাকে এমন একটা মক্বামে (উঁচুতম মর্যাদাপূর্ণ স্তরে) আসীন করবেন, যেখানে তিনি আমার পূর্বে কাউকে আসীন করেন নি এবং আমার পরেও কাউকে আসীন করবেন না।"

-[সহীহ ইবনে হিব্বান : আল্ ওয়াফা]

মক্বামে মাহমূদের তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরো বলেন, "আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে এমন এক মহান আসনে সমাসীন করবেন, যার নাম 'মক্বামে শাফা'আত', এমতাবস্থায় সেদিন পূর্বাপর সকলেই তাঁর প্রশংসা করতে থাকবে।

তাফসীরে খাযেন কিতাবে রয়েছে- 'মক্বামে মাহমূদ' মানে 'মক্বামে শাফা'আত।' ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিও উপরোক্ত তাফসীর পেশ করেন। আল্লাহ্ পাক সবাইকে আমাদের প্রিয়নবীর মহান মর্যাদা বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

---><---

শাফা'আত: রসূল-ই আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অনন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِىْ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًافَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ فَلْيُصَلِّ وَاُحِلَّتْ لِىْ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلٰى النَّاسِ عَامَّةً۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ

হযরত জাবের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমাকে পাঁচটি বস্তু (নে'মাত) দেয়া হয়েছে, যেগুলো আমার পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি। **১.** আমাকে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী ভক্তি প্রযুক্ত ভয় বিশিষ্ট চেহারা দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। **২.** আমার কারণে সমগ্র পৃথিবীকে মসজিদ তথা নামাযের উপযুক্ত এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে; সুতরাং আমার উম্মতের যে কারো কাছে নামাযের সময় হলে যেকোন জায়গায় নামায পড়ে নিতে পারবে। **৩.** আমার জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কারো জন্য হালাল করা হয়নি। **৪.** আমাকে শাফা'আতের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং **৫.** অন্যান্য নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতের জন্য।

-[বুখারী ও মুসলিম শরীফ; মিশকাত শরীফ-৫১২ পৃষ্ঠা]

হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা

সাধারণ মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এবং বাতিল অপশক্তিকে দুর্বল করার জন্য বিশেষ করে শত্রুদের কাবু করার নিমিত্তে আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে নূরানী চেহারা মুবারকে এমন একটি ব্যতিক্রমধর্মী আকর্ষণ ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ঢেলে দিয়েছেন, যা

এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করত। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। মক্কার দূর্দান্ত প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গ, যেমন- আবূ জাহল, আবূ লাহাব, ওতবা, শাইবা, ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা প্রমুখ গোপনে অনেক ষড়যন্ত্রের জাল বুনলেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সামনে দাঁড়িয়ে তা বাস্তবায়ন করার সাহস পায়নি কখনো। তাছাড়া তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন সব বৈশিষ্ঠ্য দিয়েছেন, যেগুলো অন্য কোন নবী ও রসূলকে দেননি। আলোচ্য হাদীস শরীফে এমন কতিপয় বৈশিষ্ঠ্যের কথা এরশাদ করা হয়েছে। ওইগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নেপ্রদত্ত হলো-

।। এক ।।

হযরত আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, অপর এক হাদীস শরীফে দেখা যায়- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন **نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى الْعَدُوِّ**

''আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি শত্রুদের
উপর ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় দিয়ে।''

উল্লেখিত হাদীসে 'এক মাস দূরত্ব পর্যন্ত রসূলে পাকের ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়-ভীতিসমৃদ্ধ চেহারা'র কথা বলে এটা বুঝানো হয়েছে যে, কোন দুশমন নবী পাকের চেহারা মুবারক দেখার পর এমনভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত যে, তার সমস্ত শরীরে কম্পন সৃষ্টি হত, আর তা চলার পথে তাঁর মধ্যে এক মাস পর্যন্ত বহাল থাকত।

এ জাতীয় আরো বহু হাদীস শরীফ বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 'একমাস দূরত্ব'-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজর আসক্বালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- 'মুসলমানদের প্রধান দুশমন কাফির-ইহুদী ও নাসারাদের প্রাণকেন্দ্র তথা শাম-ইরাক, ইয়ামেন এবং মিসর ইত্যাদি এলাকায় পৌঁছুতে একমাস যাবৎ চলতে হত।' -[ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত অপর হাদীসে 'একমাস'র স্থলে 'দুইমাস' দূরত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

-[তাবরানী, আল্-মু'জামুল কবীর]

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শরীর ও চেহারা মুবারকে এতই সৌন্দর্য ও সম্মোহনী প্রভাব ছিল যে, হঠাৎ কেউ দেখলেই চমকে ওঠতো আর একাগ্রচিত্তে কেবল চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকত। এ বিষয়ে তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে আবূ রমসা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি যেদিন মদীনা মুনাওয়ারায় আসলাম সেদিন প্রথমে রসূলে পাকের দর্শন লাভ হয়নি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎ দেখলাম এক অসাধারণ নূরানী অবয়বের ব্যক্তি আমাদের সামনে তশরীফ আনলেন, তাঁর পরনে ছিল দু'টি সবুজ রঙের পোষাক। আমি আমার ছেলেকে বললাম, ''খোদার শপথ করে বলছি! ইনিই হলেন আল্লাহর রসূল।'' অতঃপর আমার ছেলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী দেহ ও চিত্তাকর্ষক চেহারা দর্শনে এতবেশি প্রভাবিত হল যে, দেখলাম তার সমস্ত শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। -[মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল: ২য় খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা]

।। দুই ।।

নবী পাক এরশাদ করেন- আমার কারণে সমগ্র পৃথিবীকে মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী নবীর উম্মতগণ তাদের ইবাদত-বন্দেগী ও নামায ইত্যাদি আদায় করার জন্য নির্ধারিত ইবাদতখানা ছিল। নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া অন্য কোথাও ইবাদতের অনুমতি ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য ব্যতিক্রম। নবী পাকের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মাঠ, ময়দান, ঘর-বাড়ি-আঙ্গিনা, রাস্তা-ঘাট সব জায়গাকে পবিত্র ও ইবাদতের জন্য উপযুক্ত করে দিয়েছেন। তাই আমরা নামাযের সময় হলে যেকোন সুবিধামত পবিত্র জায়গায় নামায আদায় করে নিতে পারি। আমাদের জন্য এটা বৈধ।

বিষয়টিকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো স্পষ্ট করেছেন এভাবে- আমার উম্মতের যে কারো সামনে নামাযের ওয়াক্ত হাযির হলে সে যেখানেই থাকুকনা কেন, নামায পড়ে নিলে তা আদায় হয়ে যাবে। পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে- **فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ** অর্থাৎ তোমরা যেদিকে চেহারা ফেরাও সেদিকেই আল্লাহকে পাবে। (অর্থাৎ সবখানেই আল্লাহ'র নূরী যাতের অস্তিত্ব বিদ্যমান)।

হাদীসে পাকের আলোচ্য বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, সমগ্র যমীনের উপর নামাযের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইসলামী ফিক্বহের দৃষ্টিতে এরপরও কিছু জায়গায় নামায পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ পরিলক্ষিত হয়। ওইগুলো হচ্ছে- যেমন- কবরস্থান, গোসলখানা, উট-গরু বাঁধার জায়গা এবং ওই সব জায়গা যেখানে নাপাকী লেগে আছে ইত্যাদি। উল্লেখ্য এ গুলোও নির্দিষ্ট কারণ সাপেক্ষে। বস্তুত উল্লেখিত জায়গাগুলোও উল্লিখিত অবস্থা বিরাজ করার পূর্বে নামাযের উপযোগী ছিল।

।। তিন ।।

তৃতীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল- যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তথা গণীমতের মাল আমাদের প্রিয়নবীর জন্য হালাল ঘোষণা করা হয়েছে, যা অন্য কোন নবীর জন্য হালাল ছিল

না। পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য গণীমতের মাল বৈধ ছিল না। তাই তাদের গণীমতের সম্পদসমূহ আগুন গ্রাস করে ফেলত। এর রহস্য ছিল- তাদের জিহাদ যেন গণীমত লাভের উদ্দেশ্যে না হয়, বরং নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে হয়। কেননা, তাদের অন্তরে নিষ্ঠার অভাব ছিল।

পক্ষান্তরে, উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য গণীমত হালাল করা হয়েছে; কেননা এ উম্মতের অন্তরে নিষ্ঠার প্রাধান্য ছিল; গণীমত লাভ প্রধান উদ্দেশ্য নয়।

ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের ঘটনা পর্যালোচনা করলে বাস্তব চিত্র ভেসে ওঠে। যাতে মুসলমানদের কোন অত্যাধুনিক এমনকি প্রয়োজনীয় অস্ত্র-সস্ত্রও ছিল না। পক্ষান্তরে দুশমনদের ভারী ভারী অস্ত্র ও হাতিয়ারের সামনে একমাত্র মহান আল্লাহর গায়েবী সাহায্যের কারণে মুসলমানগণ গৌরবগাঁথা বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। মুসলমানদের বীরত্বপূর্ণ আক্রমনে কাফির বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে তাদের অস্ত্র-সস্ত্র মাল সামগ্রী ফেলে পালিয়ে যাওয়ার পরও কোন মুসলমান ওইসব গণীমতের মালের দিকে হাতও বাড়াননি। বরং সকল গণীমতের মাল একত্রিত করা হলে মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র ক্বোরআনের বাণী অবতীর্ণ করলেন-

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلاً طَيِّبًا صلے الانفال، ٦٨–٦٩

অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ পূর্বেই একটা কথা (বিধান) লিপিবদ্ধ না করতেন, তবে হে মুসলমানগণ! তোমরা যা কাফিরগণের নিকট থেকে মুক্তিপণের মাল গ্রহণ করেছ, তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আসত। সুতরাং তোমরা আহার কর যে-ই গণীমত তোমরা লাভ করেছ, বৈধ-পবিত্র হিসেবে। -[সূরা আনফাল, ৬৮-৬৯]

আরো এরশাদ হয়েছে-

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ ج لِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ـ الفتح، ٢٠

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য তরান্বিত করবেন আর তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদেরকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন যাতে এটা মু’মিনদের জন্য এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরলপথে পরিচালিত করেন।

-[সূরা ফাতাহ্, আয়াত-২০]

।। চার ।।

اُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ অর্থাৎ আমাকে শাফা‘আতের ক্ষমতা দান করা হয়েছে।

ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে সবাই ‘এয়া নাফসী’ ‘এয়া নাফ্সী’ তথা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। অসহনীয় গরমে অতীষ্ঠ হয়ে একটু ছায়া পাওয়ার আশায় এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করবে। ঠিক সেই কঠিন মুসীবতের সময় আমাদের প্রিয়নবীই একমাত্র প্রথমে সমস্ত উম্মতের জন্য শাফা‘আত করে ক্বিয়ামতের কঠিন মুসীবত থেকে মুক্ত করবেন। তারপর আপন উম্মতের জন্য পর্যায়ক্রমে সুপারিশ করে বেহেশ্‌তে পৌঁছিয়ে দেবেন। সেদিন শাফা‘আত-ই কুবরা তথা বৃহত্তম সুপারিশ’র ক্ষমতা একমাত্র আমাদের নবী ছাড়া আর কাউকে দেয়া হয়নি। আমাদের নবী সুপারিশের দরজা উম্মুক্ত করার পর অন্যান্য সুপারিশকারীরা তাদের সুপারিশ উত্থাপন করবেন। হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُوْبِهَا وَاُرِيْدُ اَنْ اَخْتَبِىَ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِىْ فِى الْاٰخِرَةِ ـ بخاری، کتاب الدعوات

অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর জন্য একেকটি মাক্ববুল দো‘আ রয়েছে, যা দ্বারা তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দো‘আ করে থাকেন। আর আমি আমার দু‘আটা পরকালের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে চাই, যা দ্বারা পরকালে আমার উম্মতের জন্য শাফা‘আত করব। -[বুখারী শরীফ, হাদীস নম্বর ৫৯৪৫]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اَنْ يَشْفَعَ لِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ اَنَا فَاعِلٌ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيْنَ اَطْلُبُكَ؟ قَالَ اُطْلُبْنِىْ اَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِىْ عَلَى الصِّرَاطِ ـ قَالَ قُلْتَ فَاِنْ لَّمْ اَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ؟ فَاطْلُبْنِىْ عِنْدَ الْمِيْزَانِ، قَالَ قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَلْقَاكَ عِنْدَ الْمِيْزَانِ؟ قَالَ فَاطْلُبْنِىْ عِنْدَ الْحَوْضِ، فَاِنِّىْ لَا اُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ ـ

অর্থাৎ: আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’র দরবারে ক্বিয়ামত দিবসে আমার জন্য শাফা‘আত করার আবেদন করলাম। উত্তরে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হ্যাঁ আমিই শাফা‘আত করব। অতঃপর আমি আবেদন করলাম, এয়া রসূলাল্লাহ্! সেদিন আমি আপনাকে কোথায় তালাশ করব? নবী-ই পাক এরশাদ করলেন, তুমি তালাশ করবে

পুলসিরাতের পাশে'' আমি বললাম, ''যদি সেখানে আপনার সাক্ষাৎ না পাই তাহলে?'' উত্তরে আল্লাহর রসূল এরশাদ করলেন, ''তাহলে তুমি তালাশ করবে আমাকে মীযানের পাশে।'' আমি আবেদন করলাম, ''এয়া রসূলাল্লাহ্! যদি সেখানেও না পাই?'' উত্তরে আল্লাহর হাবীব এরশাদ করলেন, ''তাহলে তুমি আমাকে 'হাউয-ই কাউসারে' তালাশ করবে। কেননা, আমি সেদিন এই তিন স্থানেই থাকব। -[তিরমিযী, মুসনাদে ইমাম আহমদ, আত্তারিখুল কবির, ফাতহুল বারী]

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে-

عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

অর্থাৎ ''নিশ্চয় আপনার প্রভু আপনাকে 'মক্বাম-ই মাহমূদ'র আসনে সমাসীন করবেন।'' তিরমিযী শরীফে রয়েছে হযরত আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত আয়াতের 'মক্বাম-ই মাহমূদ'র ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এরশাদ করেন **هِيَ الشَّفَاعَة** (সেটা হল শাফা'আত)।

-[তিরমিযী, মুসনাদে ইমাম আহমদ, আল্ ওয়াফা, কৃত ইবনে জাওযী, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা]

পরিশেষে, এ হাদীস শরীফে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে আমাদের আক্বা ও মাওলা'র অনন্য মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। ওই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে হুযূরের শাফা'আতের অনন্য ক্ষমতা। এটা ছাড়াও প্রসিদ্ধ সনদে আরো বহু হাদীস শরীফ রসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শাফা'আতের প্রমাণ বহন করে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে কিছু সংখ্যক মুসলমান নামধারী জ্ঞানপাপী নবী পাকের শাফা'আতকে অস্বীকার করে বসেছে। তাদের জন্য এ হাদীস শরীফ ও এর ব্যাখ্যা সত্যের পথ প্রদর্শন করবে। বস্তুতঃ যারা নবী পাকের শাফা'আতকে অস্বীকার করে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী নয়। এরা ভ্রান্ত ও জাহান্নামী। এরা নবীদ্রোহী। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এদের ভ্রান্ত আকীদামুক্ত ও পবিত্র রেখে ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনার এবং নবী পাকের সত্যিকার শান-মান ইত্যাদি উপলব্ধি করার তাওফীক্ব দান করুন ও পরকালে প্রিয়নবীর শাফা'আত নসীব করুন; আ-মীন্।

--><--

খতমে নবুয়ত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلٰثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ نَبِىُّ اللّٰهِ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ

অনুবাদ

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, খুব শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে ৩০জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহ্র নবী বলে ধারণা করবে। অথচ আমিই শেষ নবী, আমার পরে কোন (নতুন) নবী নেই।

-[মুসলিম শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ; মিশকাত শরীফ ৪৬৫ পৃষ্ঠা]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মহান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন যুগে যুগে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যত নবী-রসূল পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হলেন- আমাদের প্রিয়নবী সমস্ত নবীদের প্রধান, রহমাতুল্লিল আলামীন, সমগ্র সৃষ্টির মূল উৎস হুযূর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তিনি খাতামুন্ নাবীয়্যীন। তাঁর আগমনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ নুবূয়তের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর পরে আর কোন নবী-রসূল আসার প্রয়োজনও নেই। কারণ তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ধর্মের পরিপূর্ণতা দান করেছেন। খতমে নুবূয়তের এই আক্বীদা পোষণ করা প্রতিটি ঈমানদারের জন্য অপরিহার্য। তাই কেউ যদি নবী-রসূল হওয়ার দাবি করে কিংবা কেউ যদি খতমে নুবূয়তের আক্বীদাকে অস্বীকার করে তবে সে মিথ্যাবাদী ও কাফির। পবিত্র ক্বোরআন-হাদীস-ইজমা'-ক্বিয়াস তথা ইসলামী শরীয়তের দলীল চতুষ্টয় দ্বারা এ আক্বীদা প্রমাণিত। এমনকি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآاَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا

অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্র রসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

-[সূরা আহযাব]

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাফসীরে দুর্‌রে মনসূর গ্রন্থে আব্‌দ ইবনে হুমায়্‌দ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র সূত্রে বর্ণনা করেন-

عَنِ الْحَسَنِ رضي الله عنه فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ قَالَ خَتَمَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ اٰخِرُ مَنْ بُعِثَ

অর্থাৎ- হযরত হাসান রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে 'খাতামুন্ নাবীয়্যীন'র ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের সিলসিলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। তিনি সর্বশেষ নবী ও রসূল।

তাফসীরে খাযিন-এ রয়েছে-

خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ خَتَمَ اللّٰهُ بِهِ النُّبُوَّةَ فَلَانُبُوَّةَ بَعْدَهٗ اَىْ وَلَامَعَهٗ

অর্থাৎ-'খাতামুন্ নাবীয়্যীন' অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্'র মাধ্যমে নুবূয়তের ধারা খতম করে দিয়েছেন; সুতরাং তাঁর পরে নবী আসার সিলসিলা পরস্পরা জারি থাকতে পারে না।

এভাবে খতমে নুবূয়ত বিষয়টি পবিত্র ক্বোরআনের শতাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে শেষ নবী সেই বিষয়টি অসংখ্য হাদীস আর ইজমা' এবং কিয়াস দ্বারাও প্রমাণিত।

হযরত আবূ হুরায়্‌রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাঁদের জাতির উপর নেতৃত্ব দিতেন যখনই কোন নবী ইন্তিকাল করতেন তখনই পরবর্তী নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোন নবী আসবে না।

অপর হাদীসে রয়েছে اَنَا خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ (আমিই শেষ নবী, আমার পর কোন নবী নেই)। ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষণেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন- হে লোকসকল! আমার পর আর কোন নবী আগমন করবে না এবং তোমাদের পর আর কোন নতুন উম্মত হবে না। অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের মালের যাকাত আদায় করবে। তোমাদের ধর্মীয় নির্দেশকদের আদেশ মান্য

করবে। তাহলেই তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

পবিত্র ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র অসংখ্য অকাট্য দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত খতমে নুবূয়তকে যদি অস্বীকার করে কিংবা নতুন করে কেউ 'নবী' দাবি করে তবে সে হবে মিথ্যাবাদী ও কাফির। আলোচ্য হাদীসের মূল বিষয়বস্তু এটাই।

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফের পর আরবের কতিপয় লোক নুবূয়াত দাবি করে বসেছিল। তাদের উত্থানের সাথে সাথে তৎকালীন শাসক, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যোগ্যতম উত্তরসূরি ও ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কঠোর হস্তে তাদের দমন করে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে এক মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধার করেন।

মুসায়লামাতুল্ কায্যাব, আসওয়াদ আনাসী, শাজাহসহ আরো কতিপয় ভণ্ড নবীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের আত্মপ্রকাশের অনেক পূর্বেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এদের ব্যাপারে অনাগত ভবিষ্যতের প্রজন্মকে জানিয়ে দিয়েছিলেন; যা নবী পাকের ইল্‌মে গায়্‌বের সত্যতা প্রমাণ করে। পরবর্তী সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ইন্তিকালের পর সাহাবা-ই কেরামের সময়ে খতমে নুবূয়তের আক্বীদার বিষয়ে ইজমা' সংঘটিত হয়। তাই সাহাবা-ই কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে মিথ্যা নুবূয়তের দাবিদার মুসায়লামাকে কাফির আখ্যায়িত করেন এবং সিদ্দীক্ব-ই আকবার'র নির্দেশে বীর সিপাহসালার হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র নেতৃত্বে আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের এক বিশাল বাহিনী মুসায়লামা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কঠোর হস্তে তৎকালীন ভণ্ডনবীদের দমন করলেও পরবর্তীতে আরো কতিপয় ভণ্ড নবীর আবির্ভাবের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلٰثُوْنَ অর্থাৎ অচিরেই আমার উম্মতের মধ্য হতে ৩০জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে।

রসূলের ভবিষ্যৎ বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। রসূল-ই আকরাম'র পরবর্তী সাহাবী, তাবে'ঈ, তাব'ই তাবে'ঈনের যুগ পেরিয়ে যুগ যুগান্তরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে ওই সমস্ত ভণ্ডনবী, যাদেরকে সমসাময়িক হক্বানী ওলামা-ই কেরাম কাফির ও মুরতাদ ফতোয়া দিলেও হতভাগা কতিপয় লোক ওই সমস্ত ভণ্ডনবীর ধোঁকায় পতিত হয়ে নিজেদের ঈমান ও আমলকে সর্বনাশ করেছে।

ক্বাদিয়ানী বর্তমানের সর্বনাশা ফিৎনা

ইতিহাসে যেসব ভণ্ডনবীর নাম পাওয়া যায়, তাদের অন্যতম ভণ্ডনবী হল ‘মির্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী’ এবং তার প্রবর্তিত মতবাদের নাম হল ‘ক্বাদিয়ানী’ মতবাদ। বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে, মুসলিম বিশ্বে এ মতবাদ আজ বিষফোঁড়ার আকার ধারণ করেছে। এদের চাকচিক্যের গোলকধাঁধায় পতিত হয়ে অনেক সরলমনা মুসলমান ঈমানহারা হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের কোন কোন রাষ্ট্রে এদেরকে রাষ্ট্রিয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হলেও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্র বলে খ্যাত আমাদের বাংলাদেশে এদেরকে আলিম সমাজ কাফির ও মুরতাদ ঘোষণা দিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও এ যাবৎকালের কোন সরকারই সেদিকে কর্ণপাত করছেনা, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রিয়নবীর শান-মান নিয়ে এরা খেল-তামাশা করবে নবীপ্রেমিক মুসলমানরা তা নীরবে সহ্য করে যাবে তা হতে পারে না। ক্বাদিয়ানীদের আক্বীদা বিশ্বাস কত যে মারাত্মক তা আমাদের অনেকেই জানেন না। তাই তাদের কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি, যা মির্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী তার বিভিন্ন বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছে:

১. আমি তো সুসংবাদের ভিত্তিতে এসেছি, ঈসা(আ) কোথায়, যে আমার মিম্বরে পা রাখবে?- [ইযালায়ে আওহাম, ১৫৮ পৃষ্ঠা]

২. আমার ভ্রমণ কারবালায় হয়। একশত হুসাইন আমার পকেটে আছে। -[দুররে সমীন, ১৭১ পৃষ্ঠা]

৩. আমি মাসীহ-এ যামানা, আমি কালীমুল্লাহ্ অর্থাৎ মূসা (আ.), আমি মুহাম্মদ ও আহমদ মুজতবা। -[তিরয়াকুল কুলূব, ৩য় পৃষ্ঠা]

৪. আমার আগমনে সকল নবী জীবিত হয়ে গেছেন, সকল রসূল আমার জামায় লুক্কায়িত। -[দুররে সমীন, ১৭৩ পৃষ্ঠা]

এভাবে আরো বহু ভ্রান্ত আক্বীদা রয়েছে, যা স্বল্প পরিসরে আলোচনা সম্ভব নয়। তবে এতটুকু বলতে হয়, ক্বাদিয়ানীরা আলাদা নবী বানিয়ে নিয়েছে। আলাদা ক্বোরআনও তৈরি করেছে, যার নাম ‘তাযকিরা’। মুসলমানদের নিকট তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল, ক্বোরআন’র মর্যাদা যেরূপ, ক্বাদিয়ানীদের নিকট ‘তাযকিরা’র মর্যাদা তদ্রূপ। তারা নিজেদেরকেই কেবল মুসলমান মনে করে, বাকি সবাইকে কাফির মনে করে। এরা মির্জা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীকে কখনো নবী, কখনো সংস্কারক, কখনো মসীহে মাওঊদ ইত্যাদি বলে থাকে।

এক কথায় এরা ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন। এরা ইসলামের চিরশত্রু ইহুদি-নাসারার গড়া। এরা মুরতাদ, কাফির। এদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা আজ সময়ের দাবি।

---><---

যাঁরা হাশরের দিন আরশের ছায়ায় থাকবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّاظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَفِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّافِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ مشكوة: صفحه ٦٨

অনুবাদ

হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ পাক তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবেনা: ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. ওই যুবক যে আল্লাহ্’র ইবাদতে বেড়ে ওঠেছে (তাঁর যৌবনকাল আল্লাহ্’র ইবাদতে কেটেছে), ৩. ওই ব্যক্তি যার অন্তর সারাক্ষণ মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকে একবার (নামায পড়ে) বের হয়ে পুনরায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। ৪. ওই দু’ব্যক্তি, যারা একমাত্র আল্লাহ্’র ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসে। তারা আল্লাহ্’র সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই পরস্পর একত্রিত হয় আর (আল্লাহ্’র সন্তুষ্টির জন্যেই পরস্পর) বিচ্ছিন্ন হয়। ৫. ওই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তখন তাঁর চক্ষুযুগল অশ্রুসজল হয়ে যায়। ৬. ওই ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী রমনী আহ্বান করে আর সে বলে, ‘‘আমি আল্লাহকে ভয় করি’’। এবং ৭. ওই ব্যক্তি, যে এমনভাবে গোপনে আল্লাহ্’র রাস্তায় দান করে যে, তার বাম হাত জানলনা তার ডান হাত কী দান করল।

[বুখারী ও মুসলিম শরীফ; মিশকাত: ৬৮ পৃষ্ঠা]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

একটি সুস্থ সমাজ ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র সবারই কাম্য। একজন রাষ্ট্রনায়ক কিংবা সমাজপতি যতক্ষণ ন্যায়-নীতিবান হবে না, ততক্ষণ সেক্ষেত্রে কোন ধরনের কল্যাণ আশা করা অরণ্যে রোদন মাত্র। যুব সমাজের নৈতিক ও চারিত্রিক

অবক্ষয়ের কারণে আজকের বিশ্ব জর্জরিত, কলুষিত। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কেন্দ্র হতে শুরু করে রান্নাঘর পর্যন্ত যখন দুর্নীতি, অবাধ্যতা আর অবিচারের কলুষতায় ছেয়ে যায় তখন মুক্তির আশা করা বৃথা বৈ-কি! অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয় প্রতিটি নাগরিক কোন না কোনভাবে। আজকের বিশ্বে দৃষ্টি দিলেই দেখা যায়, কোথাও কেউ সুখে নেই। এক ধরনের অপ্রাপ্তি আর অস্থিরতা ঝেঁকে বসেছে সবার মস্তিস্কে। আর তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে তাদের জীবনীশক্তি। তাইতো সবাই হন্যে হয়ে ছুটছে সেই প্রশান্তির অন্বেষণে, মন্ত্র-তন্ত্রের পাতায় পাতায় চষে বেড়াচ্ছে; কিন্তু এতটুকু শান্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ, শান্তির নীড় আমাদের ঘরে। আমরা মুসলমান বিশ্বে শ্রেষ্ঠজাতি। বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা হলেন আমাদেরই প্রিয় নবী। ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ রাষ্ট্র পর্যন্ত তিনি মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গনের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান এবং পথচলার দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন আমাদেরকে অত্যন্ত সুনিপূণভাবে।

আলোচ্য হাদীস শরীফ ওই ধরনের একটি গাইডলাইন। হাদীস শরীফে উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত হয়ে মানুষ তাদের জীবন পরিচালনা করতে পারে, তাহলে পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্র সব ক'টি হয়ে ওঠবে উন্নত, সমৃদ্ধশালী ও সুস্থ।

প্রথমতঃ একজন রাষ্ট্রপ্রধান যদি ন্যায়পরায়ণ হন তাহলে ওই রাষ্ট্রে কোন অবস্থাতেই দুর্নীতি থাকতে পারে না, চলতে পারেনা কোন ধরনের স্বজনপ্রীতি আর অবিচার। কর্মচারী, কর্মকর্তা ইত্যাদির মন-মানসিকতায় আসবে বিরাট পরিবর্তন। ফাঁকিবাজির কোন অবকাশ থাকবে না। ফলে রাষ্ট্রের উন্নয়নের ধারা হবে দ্রুত গতিশীল। মূলত: একজন সুশাসক চাইলে তার দক্ষ পরিচালনা ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের পরিবর্তন আনতে সক্ষম। কবির ভাষায়-

যুগ যামানা পাল্টে দিতে চাইনা অনেক জন
শুধু একটি মানুষ আনতে পারে জাতির জাগরণ।

অবশ্য তাকে হতে হবে মুত্তাক্বী তথা খোদাভীরু। পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى অর্থাৎ ''তোমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর, কারণ এটাই তাক্বওয়ার নিকটতম পন্থা।''

পবিত্র হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

অর্থাৎ ''তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর সেই দায়িত্বের জবাবদিহি তাকেই করতে হবে।'' [বুখারী]

সুতরাং, বাদশা বা শাসক যদি ন্যায়পরায়ণ হন তাহলে তার সর্বোচ্চ পুরস্কার

পারলৌকিক শান্তি তথা বেহেশ্‌ত এবং হাশরের ময়দানের প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে যেদিন মানুষ দিক-বিদিক ছোটাছুটি করবে সেদিন কোন ধরনের ছায়া থাকবে না একমাত্র মহান আল্লাহ্'র আরশের ছায়া ব্যতীত। সেদিন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ওই ছায়ায় আশ্রয় পাবেন। এভাবে নবী করীম আরো যারা আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবেন ধারাবাহিকভাবে তাঁদের নাম ঘোষণা দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: ওই যুবক, আল্লাহ্'র ইবাদতের মাধ্যমে যার যৌবনকাল কেটেছে। আমরা জানি মানুষের জীবনে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ সময় হচ্ছে যৌবনকাল। বিভ্রান্তির বেড়াজালে আক্রান্ত হয়ে পড়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে এ সময়টাতে। ইবলীস-শয়তানও ওঠেপড়ে লেগে থাকে তাকে পথচ্যুত করার জন্য। সবদিক বিবেচনায় একজন যুবক নিজের রিপুকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করে সফলতার পানে এগিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। এমনকি হাদীস শরীফে একে বড় জিহাদ বলা হয়েছে। সুতরাং, যৌবনকালের ইবাদত মহান আল্লাহ্'র নিকট বেশি পছন্দনীয়। তাই তাদের পুরস্কার স্বরূপ হাশরের ময়দানে আরশের ছায়ায় তাদেরকেও শামিল করা হবে।

তৃতীয়তঃ ওই ব্যক্তি যার অন্তর সারাক্ষণ মসজিদের পানে লেগে থাকে। হাদীস শরীফের ভাষায় মহান আল্লাহ্'র কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হল মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জায়গা হল বাজার। হাট-বাজারে বর্তমানে নানা ধরনের আড্ডা এবং যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। পক্ষান্তরে সে আশঙ্কাময় স্থান থেকে বিমুখ হয়ে যখন যুবসমাজ মসজিদমুখী হয়ে ওঠে তখন তাদের মন মানসিকতাও খোদাভীরুতায় ভরপুর হয়ে যায়। অধিকন্তু মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষকে নিয়মতান্ত্রিকতা শিক্ষা দেয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী নিষ্পাপ শিশুর মত দিনাতিপাত করে থাকেন। মিথ্যা, জুলুম, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতারণা ইত্যাদি অপকর্ম তাকে স্পর্শ করতে পারে না। ফলে সমাজে ফিরে আসে শান্তির পরিবেশ।

চতুর্থতঃ মানুষ সামাজিক জীব। তাই একাকী সে বসবাস করতে পারে না। সমাজে চলতে গেলেই প্রয়োজন হয় বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, ভালবাসা ইত্যাদি। সমাজের মানুষ একে অপরের সহযোগী হিসেবে কাজ করলে তারা এগিয়ে যেতে পারে অনেক দূরে- যদি না তাদের সেই প্রীতির অভ্যন্তরে জাগতিক উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে। কারণ যেখানে কৃত্রিমতা থাকে সেখানে চূড়ান্ত সফলতা আসতে পারেনা। ইসলাম অকৃত্রিম ভালবাসার শিক্ষা দিয়েছে। একমাত্র আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই একে অপরকে ভালবাসলে তাদের জন্য রয়েছে পরকালের ওই পুরস্কার।

পঞ্চমতঃ আমাদের সবার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্। তিনিই আমাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদির ব্যাপারে ভাল জানেন এবং কোথায় আমাদের জন্য সুখ-শান্তি রয়েছে কোন্ পথে চললে শান্তি পাওয়া যাবে সেটা তিনিই একমাত্র ভাল জানেন। আজকের বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে জিজ্ঞেস করা হলে জানা যাবে, সবাই কম-বেশি অশান্তির আগুনে পুড়ছে। সেই অশান্তির লেলিহান শিখা হতে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা সবারই। আর সেটা পূরণের জন্য একটি মূল-উপায় স্বয়ং রব্বুল আলামীন শিখিয়ে দিয়েছেন। আর তা হল- আল্লাহ্'র যিকর্। যেমন এরশাদ হচ্ছে- **اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ** অর্থাৎ ''শোনে! আল্লাহ্'র যিকর্'র মাধ্যমেই অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত হয়।''

ষষ্ঠতঃ পবিত্র ইসলাম ধর্মে ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর তার শাস্তির বিধানও করা হয়েছে কঠোরভাবে। আর ওই ধরনের নিশ্চিত মহাপাপ থেকে ফিরে আসা সত্যিকারের ঈমানদারের পরিচায়ক। একমাত্র খোদাভীতির কারণেই বান্দা ব্যভিচার হতে দূরে সরে আসতে পারে। তাই তার পুরস্কার হিসেবে হাশরের ময়দানে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করা হবে।

সপ্তমতঃ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্'র প্রিয় বান্দা। তবে ওই দান হতে হবে নিরেট তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে। লোক দেখানো কিংবা লোকে দানশীল বলুক সে উদ্দেশ্যে যদি দান করা হয় তাহলে তা আল্লাহ্'র দরবারে কবূল হবেনা। এরশাদ হচ্ছে-

اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ

অর্থাৎ, ''নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের আকৃতি ও ধন-সম্পত্তির দিকে দেখেননা বরং তোমাদের অন্তর ও উদ্দেশ্যের দিকেই দেখেন।'' তাই দান-খয়রাত করতে হবে যতটুকু সম্ভব গোপনে গোপনে। আর এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে হাশরের ময়দানে আল্লাহ্'র আরশের নিচে আশ্রয় দান করা হবে।

পরিশেষে, বলতে হয়, হাদীস শরীফে বর্ণিত সাত প্রকারের মানুষ নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান। এরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী করার ক্ষেত্রে মহান ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে আর পরকালেও তাঁরা সফল।

--><--

হাত তুলে দু'আ-মুনাজাত করা

عَنْ مَالِک بْنِ يَسَارٍرضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَأَلْتُمُواللّٰهَ فَسْئَلُوْهُ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْئَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا

অনুবাদ

হযরত মালিক ইবনে ইয়াসার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ কর তখন তোমাদের হাতের তালু প্রদর্শন কর, হাতের পৃষ্ঠ দ্বারা প্রার্থনা করো না। [আবূ দাউদ, ২০৯ পৃষ্ঠা]

হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য হাদীস শরীফে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর দরবারে দো'আ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসের ভাষ্যমতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দু'হাত ওঠিয়ে দো'আ করাই হল আল্লাহর দরবারে পছন্দনীয়। সাধারণতঃ দো'আ এক প্রকার ইবাদত যা অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর মহান আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাকে এই বরকতমন্ডিত ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করেছেন ক্বোরআনের বিভিন্ন আয়াতে। যেমন এরশাদ হয়েছে- **اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** (তোমরা আমাকে ডাক, আর আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব) আরো এরশাদ করেছেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

''নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত (দো'আ) হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে (অহঙ্কার বশতঃ) অচিরেই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'' [সূরা মু'মিন, ৬০ আয়াত]

অন্য হাদীসে এরশাদ হয়েছে- ''আল্লাহর কাছে দু'আ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন বিষয় নেই'' (তিরমীযি)। নবী-ই আকরাম আরো এরশাদ করেন **اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ** (দু'আ হচ্ছে ইবাদতের মগজ)।

[তিরমিযী]

তাফসীরে মাযহারীতে আছে- ''যারা নিজেকে বেপরোয়া মনে করে দো'আ করা থেকে বিরত থাকে এবং নিজেকে বড় মনে করে তাদের উপর খোদার গযবের সম্ভাবনা রয়েছে।''

দো'আ করার নিয়ম

স্থান-কাল পাত্রভেদে দো'আ বিভিন্নভাবে করতে ও পড়তে হয়। যেমন নামাযের

দো'আ, খাবারের দো'আ, পায়খানা প্রস্রাবের দো'আ, ঘুমানোর দো'আ ইত্যাদির সবক'টির পদ্ধতি এক নয়। কিছু দো'আ করা হয় বসে, কিছু দাঁড়িয়ে, আবার কিছু দো'আ বিছানায় শুয়ে শুয়ে। সাধারণতঃ রহমত-বরকত পাওয়ার আশায় যে দো'আ করা হয় ওই দো'আ হাত তুলে করার প্রমাণ বিভিন্ন হাদীস শরীফে দেখা যায়। যেমন- বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী করীম হাত তুলে মহান আল্লাহর দরবারে দো'আ করেছিলেন। আর বিদায় হজ্বের ভাষণে যে ঐতিহাসিক দো'আ করেছিলেন সেখানেও তিনি হাত তুলে করেছিলেন। এভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে দো'আ করার সময় নবী-ই আকরাম মহান আল্লাহর দরবারে হাত ওঠাতেন মর্মে হাদীস শরীফে প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يَرُدَّ هُمَا صِفْرًا

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লাজুক (দো'আ ক্ববূলের ক্ষেত্রে) এবং দানশীল। কোন বান্দা যখন তার কাছে দু'হাত তুলে তখন তিনি ঐ বান্দার উভয়হাত খালি ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন। [আবূ দাঊদ শরীফ, ২০৯ পৃষ্ঠা]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- নবী-ই আকরাম ইরশাদ করেন-''তোমরা আল্লাহর কাছে দো'আ কর তোমাদের উভয় হাতের তালু প্রদর্শন করে, হাতের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নয়।'' অতঃপর বললেন- **فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ** অর্থাৎ ''যখন তোমরা দো'আ শেষ করবে তারপর ওই হাতদু'টি তোমাদের চেহারার উপর মালিশ কর।''

[আবূ দাঊদ, ২০৯ পৃষ্ঠা]

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন- চেহারার উপর হাত মালিশ করার কারণ হল বান্দা হাত ওঠানোর পর উভয় হাতের তালুতে আল্লাহর দরবার হতে বরকত ও নূরে ইলাহীর ফুয়ূজাত অবতীর্ণ হয় আর সেই নূরে আলোকিত হাত চেহারায় মালিশ করলে চেহারাও নূরান্বিত হয়ে যাবে।

আবূ দাঊদ শরীফের টীকায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ক্বামূস এবং লুমআত এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে- সাধারণত: মহান আল্লাহর দরবারে দো'আ করার নিয়ম হল- উভয় হাত প্রসারিত করে দেয়া, যেমনিভাবে দুনিয়াতেও কেউ কারো কিছু চাইলে বা কিছু নিতে গেলে হাত প্রসারিত করে দেয়।

তিরমিযী শরীফের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে- হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- ''রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই

দো'আ করতেন উভয় হাত উত্তোলন করতেন আর উভয় হাত মুবারক আপন চেহারা মুবারকে মালিশ করা ব্যতীত ছেড়ে দিতেন্ না।'' আল্লামা ইবনে মালিক বলেন- হাত তুলে মুনাজাত করলে উভয় হাত আসমানী বরকতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় আর সেই হাত মুখে লাগালে তাও বরকতমন্ডিত হয়। অপর এক হাদীসে রয়েছে-

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَه بِيَدَيْهِ

''নিশ্চয় নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই দো'আ-মুনাজাত করতেন তখনই হাত ওঠাতেন আর উভয় হাত চেহারার উপর মালিশ করতেন।''

[আবূ দাঊদ, ২০৯ পৃষ্ঠা]

এভাবে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ থাকার পরও আমাদের দেশের এক ধরনের লোক বলে বেড়ায় হাত তুলে মুনাজাত করা নাজায়েয, বিদ্'আত ইত্যাদি। তারা কি আবূ দাঊদ শরীফ, তিরমীযি শরীফ, মিশকাত শরীফসহ প্রসিদ্ধ হাদীস শরীফের গ্রন্থগুলোকে অবজ্ঞা করতে পারে? মূলতঃ এদের কোন লেখাপড়া নেই। বরং জুব্বা-পাগড়ি লাগিয়ে আলেম সেজে এদেশের সরলমনা মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করছে।

নামাযের পর মুনাজাত

নামায হল ঈমানদারের প্রধানতম ইবাদত। আর দো'আ হল ইবাদতের মগজ। সুতরাং নামাযের পর দো'আ করার নিয়ম সহজেই অনুমেয়। অধিকন্তু পবিত্র ক্বোরআনে করীমে মহান আল্লাহর নির্দেশ হল **فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ** অর্থাৎ যখন আপনি নামায থেকে অবসর হবেন তখন দো'আর মাধ্যমে পরিশ্রম করুন।

[সূরা ইন্শিরাহ্, ৭ আয়াত]

এ আয়াতের তাফসীরে পৃথিবীর বুকে প্রসিদ্ধ প্রায় সকল তাফসীর গ্রন্থে নামাযের পর দো'আ বা মুনাজাতের কথা বলা হয়েছে।

[দ্রষ্টব্য: ১. তাফসীরে বায়দ্বাভী, ২. তাফসীরে কাশ্শাফ, ৩. তাফসীরে মাদারিক, ৪. তাফসীরে জালালাঈন, ৫. তাফসীরে মাযহারী, ৬. আহ্কামুল ক্বোরআন, ৭. তাফসীরে ক্বোরত্ববী, ৮. তাফসীরে ইবনে আব্বাস, ৯. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১০. তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১১. তাফসীরে রূহুল বায়ান, ১২. তাফসীরে তাবারী, ১৩. তাফসীরে হাসান বসরী, ১৪. তাফসীরে খাযিন, ১৫. তাফসীরে দুররে মানসুর, ১৬. তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান ও ১৭. তাফসীরে নূরুল ইরফান ইত্যাদি।

সুতরাং উল্লিখিত প্রসিদ্ধ তাফসীরগুলোর আলোকে নামাযের পর দো'আর বিধান প্রমাণিত হল। আর দো'আর সময় হাত ওঠানোর দলিল আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত করা ক্বোরআন-সুন্নাহ্র অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। তাই দেড় হাজার বছর পর এসে হঠাৎ করে কেউ হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করা নাজায়েয, বিদ্'আত ইত্যাদি প্রমাণ করতে

চাইলে সেতো ব্যর্থ হবেই। তদুপরি তা হবে ইসলামী শরীয়তের মূলনীতির প্রতি ধৃষ্ঠতা প্রদর্শনের নামান্তর। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন-

وَاذَا سَأَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

অর্থাৎ ‘‘হে আমার হাবীব! আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (তখন বলুন) নিশ্চয় আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা দো‘আ করে আমি তাদের দো‘আ কবূল করি। যখনই আমার কাছে দু‘আ-মুনাজাত করে।

[সূরা বাক্বারা, ১৮৬ আয়াত]

প্রিয় পাঠক! আসুন আমরা একাগ্রচিত্তে মহান আল্লাহর দরবারে উভয় হাত উত্তোলন করে ভিখারী সেজে মুনাজাতে আত্মনিয়োগ করি।

--><--

মুহার্‌রম ও আশুরার রোযা

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضی الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّیَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمَ وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِیْضَةِ صَلٰوةُ اللَّیْلِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অনুবাদ

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ‘‘রমযানের রোযার পর উত্তম রোযা হল মুহার্‌রম মাসের (আশূরার) রোযা। আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হল রাত্রিকালীন (তাহাজ্জুদ) নামায। -[সূত্র: মুসলিম শরীফ]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রমযান চন্দ্রমাসগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাস। এ মাসের রোযাসহ প্রতিটি ইবাদতের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত স্বতন্ত্র। যেমন হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে রমযান মাসের এক রাক্‌‘আত নামায অন্য মাসের সত্তর রাক‘আত নামাযের চেয়েও অধিক ফযলীতপূর্ণ। এক কথায় সবদিক দিয়ে রমযানের ইবাদতের মর্যাদাই অতুলনীয়। রমযানের এ মর্যাদার অনেক কারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারণ হল এ মাস পবিত্র ক্বোরআন নাযিল হবার মাস। পবিত্র ক্বোরআনের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে রমযানুল মুবারকের মর্যাদা যেমন বেড়ে গেল, তদ্রূপ কতিপয় ঐতিহাসিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ও ইতিহাস সংশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে মুহার্‌রম মাসও বিশেষ করে আশূরার ফযীলতও মহান আল্লাহর দরবারে বেড়ে গেল। তাই এ দিবসের ইবাদত বন্দেগী এবং রোযা পালনের ফযীলত আলাদা।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

আশূরার দিনের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ:

১. আশুরার দিনে আল্লাহ্ পাক আর্‌শ, কুরসী লাওহ, কলম, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন।
২. আসমান, যমীন ও জান্নাত সৃষ্টি করেছেন এ দিবসেই।
৩. হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম এবং মুক্বার্‌রাবী ফেরেশ্‌তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ দিনে।

৪. আমাদের আদিপিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ দিনে। এ দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল এবং বেহেশ্ত হতে দুনিয়াতে অবতরণের পর সাড়ে তিনশ' বছর কান্নাকাটির পর তাঁর তাওবা ক্ববূল করা হয়েছিল এই আশূরার দিবসেই।

৫. আশূরার দিবসে আল্লাহ্ পাক হযরত ইদ্রীস আলায়হিস্ সালামকে অতি উচ্চমর্যাদা দান করেছিলেন।

৬. হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারীদের জাহাজকে মহাপ্লাবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন এই দিবসেই।

৭. আশূরার দিবসেই হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর জন্ম হয়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলা এ দিনেই তাঁকে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড হতে নাজাত দিয়েছিলেন।

৮. হযরত ইয়াকূব আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালামকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এ দিবসে।

৯. আশূরার দিনে আল্লাহ্ পাক হযরত ইয়ূনুস আলায়হিস্ সালামকে মাছের পেট থেকে মুক্ত করেছিলেন।

১০. আল্লাহ্ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে ফির'আউনের কবল হতে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফির'আউন ও তার দলবলকে নীল দরিয়ায় ডুবিয়ে মেরেছিলেন, সেদিনটি ছিল আশুরার দিন।

১১. এ দিনেই আল্লাহ্ পাক হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর তাওবা ক্ববূল করেছিলেন।

১২. আশূরার দিনেই আল্লাহ্ পাক আসমান হতে সর্বপ্রথম রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন।

১৩. আশূরা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম'র জন্মদিন এবং এ দিনেই তাঁকে আসমানে তুলে নেয়া হয়েছিল।

১৪. আল্লাহ্ পাক হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামকে এ দিনেই 'মুল্কে আযীম' তথা মহা রাজত্ব দান করেছিলেন।

১৫. এ দিনেই হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালামকে গভীর কূপ থেকে বের করা হয়েছিল।

১৬. এ দিনেই হযরত আইয়ূব আলায়হিস্ সালামকে কঠিন রোগের কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল।

১৭. এ আশূরার দিনে রোযা রাখা উম্মতের জন্য ফরয ছিল, এ হুকুম রহিত করে রমযান মাসে রোযা রাখাকে ফরয করা হয়েছে। -মুকাশাফাতুল কুলূব : ৩১১পৃষ্ঠা

১৮. সর্বশেষ এই আশূরার দিন তথা হিজরি ৬১ সনের মুহাররমের দশ তারিখ আমাদের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আদরের দুলাল, মা ফাতিমাতুয্ যাহ্রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার কলিজার টুকরা, বেহেশ্তী যুবসরদার হযরত ইমাম হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুখ্যাত ইয়াযীদের কালোহাত থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষাকল্পে ঐতিহাসিক কারবালার ময়দানে শাহাদাত ক্ববূল করেছেন।

১৯. মুহাররমের দশ তারিখ তথা আশূরার দিবসেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।

আশূরার ফজীলত

আশূরার দিবসে ইবাদত-বন্দেগীর ফযীলত অপরিসীম। পূর্ববর্তী নবীগণ এ দিবসে রোযা পালন করতেন। আর আমাদের শরীয়তে এ দিবসের রোযা রাখা মুস্তাহাব। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- ''হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারা হিজরত করে এসে দেখতে পেলেন- মদীনার ইহুদীরা আশূরার দিনে রোযা পালন করছে। আল্লাহ্র রসূল তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এ দিনে রোযা পালন কর কেন? তারা বলল, এটা এমন দিন যেদিন আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফিরআ'উন ও তার অনুসারীদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। মূসা আলায়হিস্ সালাম এ দিনের নাজাতের শুকরিয়া আদায়ার্থে রোযা পালন করতেন; আমরাও তার অনুসরণে রোযা পালন করি। আল্লাহ্র রসূল এরশাদ করলেন, তোমাদের চেয়ে আমরা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র বেশি হক্বদার এবং অধিক ঘনিষ্ট। এরপর হতে আল্লাহ্র রসূল ওই দিবসে নিজেও রোযা রাখতেন আর উম্মতদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।'' -[বুখারী ও মুসলিম শরীফের সূত্রে 'মিশকাত' : ১৮০ পৃষ্ঠা]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত অপর এক হাদীস শরীফে রয়েছে, তিনি বলেন- রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন আশুরার দিনের রোযা রাখলেন এবং ওই দিনে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন তখন সাহাবা-ই কেরাম আরয করলেন, এয়া রসূলাল্লাহ! এ দিনকে তো ইহুদি ও নাসারাগণ সম্মান করে (আমাদের এক দিনের রোযা তো তাদের সমতুল্য হয়ে যাচ্ছে?) তখন আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি যদি আগামী বছর তোমাদের মাঝে থাকি তাহলে নয় তারিখেও অবশ্যই রোযা রাখব (ইহুদী-নাসারাদের সাথে পার্থক্য করার জন্য)। -মুসলিম

সুতরাং হাদীসের ভাষ্যমতে প্রমাণিত হয়, ইহুদীদের সাথে ভিন্নতা রক্ষার্থে মুহার্‌রমের ৯ ও ১০ উভয় তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব। আল্লামা ইবনে হুম্মাম রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন- ১০ তারিখের আগের ও পরের দিনসহ মোট তিনদিন নফল রোযা রাখা মুস্তাহাব। সাইয়িদুনা হযরত ক্বাতাদাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''আল্লাহ্‌র উপর আমার ধারণা যে, আশূরার রোযা এক বৎসরের পূর্বের গুনাহ্‌কে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।''

-সহীহ মুসলিম শরীফ : ৫৯০ পৃষ্ঠা : হাদীস নম্বর-১১৬২

গুনিয়াতুত্ তালেবীন কিতাবে রয়েছে- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- ''যে ব্যক্তি আশূরার রোযা রাখবে আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলনামায় ষাট বছরের নামায-রোযার সাওয়াব দান করবেন এবং তাকে এক হাজার শহীদের সাওয়াব দান করা হবে।''

--><--

আহ্‌লে বায়্‌তে রসূল কিশ্‌তিয়ে নূহ

عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ رضی الله عنه قَالَ وَهُوَ اٰخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلَا اِنَّ مَثَلَ اَهْلِ بَيْتِیْ فِيْكُمْ مَثَلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ عليه السلام مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ رَوَاهُ اَحْمَدُ

অনুবাদ

হযরত আবূ যর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি পবিত্র কা'বা ঘরের দরজা হাত দিয়ে ধরা অবস্থায় বলেন, আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হিস্ সালামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে আমার আহ্‌লে বায়তের দৃষ্টান্ত হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম'র জাহাজের মত। যে এতে আরোহন করেছে সে মুক্তি পেয়েছে, আর যে এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সে ধ্বংস হয়েছে।

-[মুসনাদে ইমাম আহমদ: সূত্র: মিশকাত ৫৭৩ পৃষ্ঠা

বর্ণনাকারীর নাম জুনদুব ইবনে জুনাদা। উপনাম 'আবু যর' সমধিক পরিচিত। গিফার গোত্রের লোক হিসেবে তাকে আল গিফারী বলা হত। ইসলামের সূচনালগ্নেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সিরাতের কিতাবসমূহে তাকে পঞ্চম মুসলমান হিসেবে গণনা করা হয়। হিজরি পঞ্চম সনে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করার পর সর্বক্ষণ রাসূলে পাকের সাহচর্যে থাকতেন। যাতুর রিক্বা যুদ্ধে যাত্রাকালে নবী করীম তাকে মদীনা শরীফের আমির নিযুক্ত করেন। এক জন সাধক, পন্ডিত পাশাপাশি মিতব্যয়ী ও সংযমী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির চরম বিরোধীতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সর্বমোট ২৮১টি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ইসলামের বহু খিদমত আনজাম দিয়ে পরিশেষে হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফত আমলে হিজরি ৩২ সনে ৮ যিলহজ্ব ইন্‌তিকাল করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম'র যমানার তুফান ইতিহাস বিখ্যাত এক ঘটনা। নূহ আলাইহিস সালাম'র প্রতি অবাধ্য লোকদেরকে শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে মহান রব্বুল আলামীন সেই তূফানরূপী আযাবের ব্যবস্থা করেছিলেন। পাশাপাশি অনুগত উম্মতকে পরিত্রাণ প্রদানের লক্ষে একটি জাহাজ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন

স্বীয় নবীকে। যথারীতি জাহাজ তৈরি শেষ হলে রজব মাসের দুই তারিখ প্লাবন আরম্ভ হয়। অনুগত উম্মত আর দুনিয়ার যাবতীয় পশু-পাখীর এক জোড়া করে এবং বিভিন্ন প্রকার ফল-মূলের গাছের চারা ওই জাহাজে উঠানো হলো। সেদিন যারা হযরত নূহ আলাইহিস সালাম'র সেই জাহাজে আরোহণ করেছিলেন বা করার সুযোগ পেয়েছিলেন তারা মুক্তি পেয়েছিল পক্ষান্তরে যারা এতে আরোহণ করেনি তারা জ্বলোচ্ছাসে ডুবে মরেছিল। এমনকি ওই ডুবন্তদের মধ্যে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম 'র এক স্ত্রী ও পুত্র কেনানও ছিল। কারণ তাদেরকে বারবার বলার পরও জাহাজে আরোহণ করেনি। দীর্ঘ ছ'মাস পর তুফান শেষ হল আর অবাধ্যরা ধ্বংস হয়ে গেল।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম'র উম্মতের উপর যেমন তুফান এসেছিল শেষ যামানায় উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরও তুফান আসতে পারে এটা নিশ্চিত জানতেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তবে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম'র উম্মতের তুফানটা ছিল বাহ্যিক তথা প্রকাশ্য; কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীর উপর তুফানটা হবে অপ্রকাশ্য। তাদের ঈমান আক্বীদার উপর বয়ে যাবে সেই মহাপ্লাবন। সে প্লাবনের শ্রোতে হারিয়ে যাবে অনেকের মূল্যবান ঈমান। তাই অনেক আগেই পবিত্র হাদীস শরীফের বাণীতে উম্মতে মুহাম্মদীর ধ্বংসাত্মক তুফান হতে মুক্তির ঠিকানাও দেখিয়ে গেছেন দয়ালুনবী রহমাতুল্লিল আলামীন সরকারে দু'আলম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী করীম ইরশাদ করেন, প্লাবন হতে রক্ষাকল্পে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম যেমন মুক্তির জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন তেমনি আমি আমার বিপদগ্রস্ত উম্মতের জন্য মুক্তির জাহাজ তথা আমার আহলে বাইতকে রেখে গেলাম। আমার আহলে বাইতের সাথে যাদের সম্পর্ক থাকবে তারা মুক্তি পাবে।

আহলে বায়তের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সা'ঈদ খুদ্‌রী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং তাবে'ঈ হযরত মুজাহিদ, হযরত ক্বাতাদাসহ অন্যান্য মুফাস্‌সিরের মতে আহলে বায়ত বলতে 'আলে আবা' (চাদরাবৃত) কে বুঝানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন 'চাদর আবৃত' কারা? তার বর্ণনা অন্য একটি হাদীস শরীফে এসেছে- উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোর বেলায় তাঁর হুজুরায় প্রবেশ করলেন। ওই সময় তার দেহ মোবারকে কালো নকশা বিশিষ্ট চাদর ছিল । কিছুক্ষণ পর ফাতিমা আসলে

নবীজী তাঁকে চাদরের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এরপর আসলেন আলী। নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও চাদরের ভিতরে প্রবেশ করালেন। অতঃপর হাসান-হুসাইন উভয়ে আসলে তাঁদেরও চাদরে আবৃত করে নিলেন। আর পবিত্র ক্বোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

অর্থাৎ হে আহলে বায়ত! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। অতঃপর দো'আ করলেন-

اَللّٰهُمَّ هَؤُلاَءِ اَهْلُ بَيْتِىْ وَخَاصَّتِىْ فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত এবং ঘনিষ্টজন। আপনি এদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করুন আর এদেরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করুন। কেউ কেউ বলেন এই দো'আ করার পরই উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল।

আহলে বায়তের মুহব্বত নবীজির সুন্নত

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, উল্লিখিত আয়াত নাযিল হবার পর হতে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমাতুয যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলতেন আস্‌সালামু এয়া আহলাল বাইতি ওয়া ইউত্বাহ্‌হিরুকুম তাতহীরা। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর মতে এই আমল সাতদিন পর্যন্ত জারি ছিল।

আহলে বায়তের প্রতি মহব্বত মুক্তির পথ

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বিদায় হজ্বে আরাফাতের দিন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ক্বাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণরত অবস্থায় বলতে শুনেছি-

يَاَيُّهَاالنَّاسُ اِنِّىْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَااِنْ اَخَذْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابُ اللّٰهِ وَعِتْرَتِىْ اَهْلَ بَيْتِىْ

অর্থাৎ হে লোকেরা! আমি তোমাদের মধ্যে যা রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং আমার বংশধর তথা আহলে বায়ত। [তিরমিযী শরীফ, মিশকাত শরীফ-৫৬৫ পৃষ্ঠা]

হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لِقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحِبُّ اِلَىَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِىْ

অর্থাৎ ওই সত্তার ক্বসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার নিকট আমার আত্মীয় অপেক্ষা নবী-ই আকরামের আত্মীয় অধিক প্রিয়। [বুখারী শরীফ]

এভাবে আরো বহু রেওয়ায়াত আছে, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর ফারুক্বে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার অন্তরে আহলে বায়তের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। এভাবে অন্য সাহাবীগণও আহলে বায়তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।

একদা হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর চাদরের আঁচল দ্বারা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র চরণযুগল হতে ধুলাবালি মুছে পরিস্কার করে দিচ্ছেলেন, এতে একটু বিচলিত হয়ে হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ওহে আবূ হুরায়রা আপনি একি করছেন? হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে সাহেবজাদা! আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার পদমর্যাদা সম্পর্কে আমি যা জানি লোকেরা যদি তা জানত তাহলে তারা আপনাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরাফেরা করত।

এভাবে নবী বংশের সদস্যদের মর্যাদা যুগে যুগে মহামনিষীদের নিকট স্বীকৃত ছিল। বড় বড় মুহাদ্দিস, ফক্বীহ্, মুফাসসির, কবি-সাহিত্যিক আর ইতিহাসবিদগণ তাঁদের ক্ষুরধার লেখনীতে তার নমুনা উপস্থাপন করেছেন স্ব-স্ব গ্রন্থে।

ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন, খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালেক যখন হজ্বে গমন করলেন, তখন তিনি আসওয়াদ চুম্বনের জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছিলেন মানুষের প্রচন্ড ভিড়ের কারণে। মনে মনে কিছুটা ক্ষোভ আর অভিমানে অপেক্ষার প্রহর গুণছিলেন। আর তার সাথে ছিল সিরিয়ার একদল মানুষ। এমন সময় আওলাদে রাসূল ইমাম যায়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাওয়াফ এর জন্য যেই মাত্র হাজরে আসওয়াদের দিকে আসলেন তাওয়াফকারী মানুষেরা আপনা-আপনিতে জায়গা খালি করে দিলেন আর তিনি সহজেই হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দিলেন। এ অবস্থা দেখে জনৈক সিরিয়াবাসী বলল, তিনি কে? যাকে মানুষ এত সম্মান করছে, অথচ খলিফার প্রতি এতটুকু কেউ শ্রদ্ধা দেখাচ্ছেনা? খলিফা চেনার পরও বললেন, আমি তাকে চিনিনা। তখন ওই জায়গায় আরবের একজন প্রসিদ্ধ কবি ফরযদক্ব হাযির ছিলেন। তিনি অনেকটা

প্রতিবাদী কণ্ঠে কাব্যাকারে বলে ওঠলেন-

هٰذَا الَّذِىْ تَعْرِفُهُ الْبَطْحَاءُ وَطَأْتَهُ
وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ

অর্থাৎ তিনিতো ওই ব্যক্তিত্ব, যাকে মক্কার উপত্যকা এবং তার ধুলাবালি চিনে, বাইতুল্লাহর হিল্ল এবং হেরেম শরীফও যাকে চিনে। এরপর আরেকটা পংক্তিতে বলেন, তিনিই ফাতেমাতুয যাহরার পুত্র যদি তুমি না জান তাহলে জেনে নাও তাঁর মাতামহ খাতামুন নবীয়্যীন (শেষ নবী)।

পবিত্র ক্বোরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকাটাত্মীয়দের ভালাবাসা উম্মতের ওপর ওয়াজিব। এ পর্যায়ে পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-

قُلْ لَااَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি বলুন হে মানুষ আমি তোমাদেরকে (পথ প্রদর্শন ও ধর্মপ্রচার)'র বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আমার আত্মীয় (বংশধরদের প্রতি মুহব্বত ছাড়া) অন্য কোন প্রতিদান চাই না।

এই আয়াতে করীমা নাযিল হবার পর সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার আত্মীয় কারা, যাদের প্রতি ভালবাসা, সৌহার্দ্য আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে? নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন,তারা হল আলী, ফাতেমা, আর তাদের সন্তানদ্বয়।

[যারক্বানী আলাল মাওয়াহিব, সাওয়াইক্বে মুহরিক্বা]

হযরত আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ মির্যা মাযহার জানে জাঁনা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা ঈমানের ভিত্তি। ওই মহাত্মাগণের ভালবাসা ব্যতীত আমার কোন আমলই নাজাতের উসিলা নয়। তিনি আহলে বায়তের প্রতি মুহব্বতের কারণে সৈয়দজাদাদের প্রতিও অগাধ সম্মান প্রদর্শন করতেন, এমনকি পাঠদানের সময় যদি আশ-পাশে আওলাদে রাসূলের কোন ছোট শিশুকে খেলাধুলা করতে দেখতেন সাথে সাথে তিনি দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্মান করতেন এবং যতক্ষণ তাঁকে দেখা যেত ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। [আখবারুল আখয়ার পৃষ্ঠা-২৪১]

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ও মুফাসসিরগণ যদি আওলাদে রাসূলকে এভাবে সম্মান করেন তাহলে আমাদের কী করা উচিত তা ভেবে দেখা দরকার। অধিকন্তু ফিৎনা-ফ্যাসাদের এই সময়ে আমাদের ঈমান-আক্বীদাকে মজবুত করার জন্য এবং গোমরাহী থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম ওসীলা হল আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা। আজকের বিশ্বের আনাচে-কানাচে নবীর আওলাদগণ দ্বীন ও মাযহাবের

দায়িত্ব নিয়ে মানবজাতিকে হিদায়তের নিরলস খিদমত আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের সান্নিধ্য যারা অর্জন করতে পারবে নিঃসন্দেহে তারা সৌভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যারা সুযোগ পাওয়ার পরও এ নি'মাত হাতছাড়া করে ফেলেছে তারা হতভাগা। অবশ্য, যদি কেউ নিজেকে আওলাদ-ই রসূল বলে দাবী করে, অথচ বাতিল আক্বীদার অনুসারী এবং শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলে না, তাকে সংশোধন করাই হবে তার প্রতি সম্মান দেখানো। তাকে নির্বিচারে সম্মানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকাও জরুরী। যদি তারা সংশোধন নায় হয় তবে 'আহলে বায়ত'-এর ব্যক্তিবর্হিভূত বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে আওলাদে রাসূলের সাথে সম্পর্ক রেখে জাগতিক ও পারলৌকিক মুক্তি অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমিন।

--><--

শতাব্দির মুজাদ্দিদ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُد

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন- ''নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দির প্রান্তে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যিনি ওই দ্বীনকে নতুনভাবে সংস্কার করবেন।''

[সূত্র : আবূ দাউদ শরীফ, মিশকাত শরীফ ৩৬ পৃষ্ঠা, জামে'উস সগীর : আল্লামা সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পবিত্র ক্বোরআন, হাদীস ও ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় মানবসৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে এ পর্যন্ত সকল যুগের মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ্ তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন। এ পর্যায়ে পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে **وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا** অর্থাৎ কোন রসূল প্রেরণ ব্যতিরেকে আমি কোন বান্দাকে শাস্তি দিইনা। তাই দেখা যায় প্রতিটি যুগে আল্লাহ্র প্রেরিত নবী-রসূলগণ মানুষকে ডেকেছেন আল্লাহর পথে; মুক্তির পথে। আর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি যুগে বহু নবীর আগমণও হয়েছে। নবী-রসূলগণ তাঁদের দায়িত্ব শেষ করে নির্ধারিত সময়ে চলে গেলেন মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্যে। সর্বশেষে সায়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন আমাদের প্রিয়নবী সরকারে দো'আলম হুযূর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার বুকে আগমন করে দ্বীন ইসলামের পূর্ণতাদানের পর নুবূয়তের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী; তাই তাঁকে খাতামুন্ নাবিয়্যীন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে পবিত্র ক্বোরআনে।

নুবূয়তের দরজা চিরতরে বন্ধ ঘোষণার পর নতুন কোন নবীর আগমন হবেনা; যিনি মানুষদেরকে আল্লাহ্র পথে হিদায়ত করবেন। তাই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তির অন্ধকার হতে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য নবী করীম তাঁর যোগ্যতম অনুসারী খোলাফা-ই রাশেদীন এবং নক্ষত্রতুল্য সাহাবা-ই কেরাম রেখে গেলেন, যাঁরা দিশেহারা-পথহারা বিভ্রান্তদের হিদায়তের আলো দিয়ে গোমরাহী

থেকে রক্ষা করেছেন। তৎপরবর্তী লোকদের অবস্থা কী হবে? কে তাদেরকে দেখাবে সঠিক পথ? শয়তানী অপতৎপরতা রুখে ইসলামের মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কে? ইসলামের চিরন্তন শত্রু ইহুদি-নাসারার ষড়যন্ত্রের কবল হতে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদার হিফাযতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে কে বা কারা? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। এসব প্রশ্নের উত্তর মহান রব্বুল আলামীন তাঁর সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায় অনাগত ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করে রেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছেন আর তাঁরই প্রিয় হাবীব রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র জবান দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। এ আলোচনায় তারই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

ঈমানদার মুসলমানরা যাতে সঠিক-সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে না পড়ে সে লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার কতিপয় বান্দা সৃষ্টি করে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আবার প্রতি শতাব্দির ক্রান্তিলগ্নে একেকজন বিশেষ ব্যক্তি প্রেরণ করেন, যিনি পুরো শতাব্দিকাল ধরে ধর্মের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবয়বে গজে ওঠা অপসংস্কৃতির মূলোৎপাঠন করে নতূনভাবে দ্বীন-মাযহাবকে সংস্কার করেন; পরিভাষায় তাকে বলা হয় মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক।

মুজাদ্দিদ প্রসঙ্গ

আরবি 'তাজদীদ' শব্দের অর্থ সংস্কার করা, নতুন জীবন দান করা ইত্যাদি। আর 'মুজাদ্দিদ' শব্দের অর্থ- সংস্কারক। আর ইসলামী শরিয়তে মুজাদ্দিদ বলা হয়- মুসলিম সমাজে ধর্মের নামে অধর্ম, ক্বোরআন-সুন্নাহর তাফসীরের নামে অপব্যাখ্যাসহ শরীয়ত-তরীক্বতের মৌলিক বিষয়াবলীর উপর যখন চতুর্মুখী হামলা ও ষড়যন্ত্র ব্যাপক মাত্রা লাভ করে সর্বোপরি মুসলমানরা যখন দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে দিশেহারা মুসলিম মিল্লাতকে ইসলামের সঠিক রূপরেখা উপস্থাপনের মাধ্যমে যিনি সঠিক পথের দিকে আহ্বান করেন এবং বাতিল অপশক্তির স্বরূপ উন্মোচনে বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, এমনকি প্রয়োজনে ধর্মের দুশমনদের প্রতিরোধ আন্দোলনে দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং চূড়ান্ত সফলতা নিয়ে হতাশাগ্রস্ত মুসলিম মিল্লাতকে মুক্ত করে ছাড়েন তিনিই মুজাদ্দিদ বা দ্বীনের মহান সংস্কারক।

'মুজাদ্দিদ' কোন পৈত্রিক উত্তরাধিকার নয়। কেউ দাবি করলেই তাকে মুজাদ্দিদ বলা যাবে না। বরং তাঁর কতিপয় মৌলিক গুণাবলী রয়েছে। যেমন- ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী হওয়া, বিজ্ঞ আলিম হওয়া, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হওয়া, সত্য প্রকাশে আপোষহীন হওয়া,

সমকালীন আলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া, ধর্মপ্রচারে নির্লোভ হওয়া, মুত্তাক্বী-পরহেযগার হওয়া, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গজে ওঠা বিদ'আত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটনে বলিষ্ঠ হাতের অধিকারী হওয়া, শরীয়ত ও তরীক্বতের পূর্ণ অনুসারী হওয়া, শরিয়তবিরোধী ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকা। বিশেষভাবে একশ' শতাব্দির শেষাংশে এবং পরবর্তী শতাব্দির শুরুতে তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর বিকাশ ও সর্বজন স্বীকৃত হওয়া। এক পর্যায়ে সমসাময়িক প্রসিদ্ধ আলিম-উলামা একবাক্যে তাঁকে মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

বিগত চৌদ্দ শতাব্দির মুজাদ্দিদগণের তালিকা

প্রথম শতাব্দি : হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয
দ্বিতীয়শতাব্দি : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল
তৃতীয়শতাব্দি : ইমাম নাসাঈ
চতুর্থ শতাব্দি : ইমাম বায়হাক্বী
পঞ্চমশতাব্দি : ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালী
ষষ্ঠ শতাব্দি : ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী
সপ্তম শতাব্দি : ইমাম তাক্বী উদ্দীন
অষ্টম শতাব্দি : ইমাম হাফেয ইবনে হাজর আসক্বালানী
নবম শতাব্দি : ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী
দশম শতাব্দি : ইমাম আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী
একাদশ শতাব্দি: ইমাম শায়খ আহমদ ফারূক্বী সরহিন্দী
দ্বাদশ শতাব্দি : ইমাম মুহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব
ত্রয়োদশ শতাব্দি: ইমাম শাহ আবদুল আযীয দেহলভী
চতুর্দশ শতাব্দি: ইমাম আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা খান ব্রেলভী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

উক্ত মহান মনীষীগণ মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে বিগত চৌদ্দটি শতাব্দির প্রান্তে প্রান্তে স্ব স্ব যুগে ইসলামের নামে জেগে ওঠা দ্বীন ও মিল্লাতের বিভিন্ন অপসংস্কৃতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন এবং ইসলামের নামে সৃষ্ট বিভিন্ন বাতিল মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে তাদের কবর রচনা করেছেন যা দ্বীন-ই ইসলামের এক অবিস্মৃত অধ্যায়।

চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ

আ'লা হযরত বললেই একনামে যাকে আরবি-অনারব সবাই চিনে। ১২৭২ হিজরিতে জন্ম আর ১৩৪০ হিজরিতে তাঁর ইন্তিকাল। মধ্যখানে ৬৮ বৎসর বয়সে

একজন সফল মুজাদ্দিদ হিসেবে যতগুলো গুণাবলীর প্রয়োজন সবক'টি তাঁর চরিত্রে পাওয়া যায়। যেমন-

অসাধারণ মেধা, সাবলীল উপস্থাপনা, ক্ষুরধার লিখনী, জ্বালাময়ী বক্তব্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার-প্রতিবাদী কণ্ঠ, আমল-আখলাক্বে স্বচ্ছতা ও নিপুণতা, অকৃত্রিম নবীপ্রেম, মানবতার প্রতি সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা আর কুসংস্কারের প্রতি কঠোরতা তাঁকে একজন সফল মুজাদ্দিদ হিসেবে বিশ্বের দরবারে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলে। নবী-ই পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে মুসলিম মিল্লাতের উপর তার ত্যাগ ও অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

ডাল দী ক্বল্ব মে 'আযমতে মুস্তফা,
হিকমতে আ'লা হযরত পেহ্ লাখোঁ সালাম।

--><--

বিনা প্রয়োজনে মাথা মুণ্ডানো খারেজীদের আলামত

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِالْخُدْرِیِّ رضی الله عنه عَنِ النَّبِیِّ A قَالَ یَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَیَقْرَءُ وْنَ الْقُرْاٰنَ لَایُجَاوِزُ تَرَاقِیَهُمْ یَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّیْنِ کَمَا یَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِیَةِ ـ ثُمَّ لَایَعُوْدُوْنَ فِیْهِ حَتّٰی یَعُوْدَ السَّهْمُ اِلٰی قَوْمِهٖ قِیْلَ مَاسِیْمَاهُمْ؟ قَالَ سِیْمَاهُمُ التَّحْلِیْقُ اَوْ قَالَ التَّسْبِیْدُ ـ

অনুবাদ

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''পূর্বাঞ্চল হতে কিছু লোক বেরুবে, তারা ক্বোরআন পড়বে বটে, (তবে) তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে (অন্তর) অতিক্রম করবেনা। তারা ধর্ম হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তীর যেমন ধনুকে পুনরায় ফিরে আসেনা তেমনি এরাও ধর্মের মধ্যে আর ফিরে আসবেনা।'' (নবীপাকের দরবারে) আবেদন করা হল- ওই সমস্ত লোকের চিহ্ন কি? (তাদেরকে চেনার উপায় কি?) নবী করীম বললেন, ''তাদের চিহ্ন হল মাথা মুণ্ডানো''। অথবা বলেছেন- ''মাথা মুণ্ডিয়ে রাখা।''

[সূত্র : সহীহ বুখারী : কিতাবুত তাওহীদ হাদীস নম্বর ৭১২৩, সহীহ মুসলিম : কিতাবুয্ যাকাত হাদীস নম্বর ১০৬৮, মুসনাদে আহমদ : হাদীস নম্বর ১১৬৩২, মুসান্নাফে আবী শাইবা : হাদীস নম্বর ৩৭৩৯৭, তাবরানী : ৬ষ্ঠ খণ্ড ৯১পৃষ্ঠা : হাদীস নম্বর ৫৬০৯]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিশ্বের কালজয়ী আদর্শ এবং মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের শত্রুরা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য শত্রুদের নাম কাফির আর দ্বিতীয়টির নাম মুনাফিক্ব। প্রকাশ্যশত্রু কাফিরদের চেয়ে বহুগুণে মারাত্মক হল এ মুনাফিক্বচক্র। এদের বেশভুষা দর্শনে সাধারণ মুসলমান বিভ্রান্তির ইন্দ্রজালে আটকে পড়ে নিজের মূল্যবান ঈমান-আক্বীদা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। মুনাফিকচক্রের জন্ম কেবল আজকালকার নয়। বরং রসূলুল্লাহ্র উপস্থিতিতে

এদের দুঃসাহসিক পদচারণা লক্ষণীয়। মসজিদে নববীতে বসে বসে এক ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি চোখের পানি ফেলত, অথচ সে ছিল মুনাফিক্ব। আর নবীপাকের নুবূয়তের রাডারকে ফাঁকি দেয়ার ক্ষমতাতো তাদের ছিলনা। তাই কৌশলগত কারণে প্রাথমিক অবস্থায় তাদেরকে জনসমক্ষে চিহ্নিত না করলেও সময়মত তাদের নাম ধরে ধরে মসজিদ হতে বের করে দিয়েছিলেন স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

নবী করীম এরশাদ করেছেন- বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত ছিল। আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটিমাত্র দল ছাড়া বাকি সবাই যাবে জাহান্নামে। সাহাবীরা নাজাতপ্রাপ্ত (মুক্তিপ্রাপ্ত) দলের নাম জানতে চাইলে তিনি বললেন, ''যে দলে আমি আছি এবং আমার সাহাবীরা রয়েছে।'' -[মিশকাত : ৩০ পৃষ্ঠা]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মিরক্বাত কিতাবে লিখেছেন- এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নাম হচ্ছে ''আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত''। হযরত গাউসুল আ'যম আবদুল ক্বাদের জিলানী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তারা হল 'সুন্নী'। সুতরাং সুন্নী মুসলমান তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'র বিপরীতে যতদল বা মতাদর্শী রয়েছে, নিঃসন্দেহে তারা ভ্রান্ত, গোমরাহ্ তথা পথভ্রষ্ট।

আগেই বলা হয়েছে, কাফির-বেদ্বীনরা ইসলামের যতটুকু ক্ষতিসাধন করতে পারেনি তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে গোপনশত্রু মুনাফিক্বরা। এরা বাহ্যিক বেশভুষায় সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে মুসলমানদের ঈমানের বৃক্ষমূলে আঘাত করে। সেটাকে দিতে চায় অঙ্কুরেই বিনাশ করে।

ইসলামের নামে সৃষ্ট বাতিল দলসমূহের অন্যতম হল খারেজী ফিরক্বা। আলোচ্য হাদীসে সেই ঘৃণ্য মতবাদের একটি উল্লেখযোগ্য আলামত উল্লেখ করে দিয়ে নবী করীম পরবর্তী উম্মতদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন এদের সংশ্রব থেকে সুন্নী মুসলমানরা দূরে থেকে নিজেদের ঈমান- আক্বীদা সংরক্ষণ করতে পারে। আর সেই আলামত হল ঘন ঘন মাথা মুন্ডানো। মুসলমান নামধারী একশ্রেণীর মানুষ এখনো দেখা যায়, যারা বিনা প্রয়োজনে মাথা মুন্ডিয়ে ফেলে, এমনকি অন্যদেরকেও মাথা মুন্ডানোর ব্যাপারে জোর তাকীদ দেয়। এরা কেবল এ যুগের সৃষ্ট নয়; যুগ যুগ ধরে এরা ছিল। এদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদা ও হিংস্র মনোভাব দর্শনে প্রতিটি মুসলমানের শরীর শিহরে ওঠে। এরা খারেজী মতবাদের অনুসারী; এদের প্রবর্তক 'যুল খুয়াইসারা' নামক এক ব্যক্তি। সে নবীজপাকের ন্যায় বিচারের উপর আপত্তি করতেও দ্বিধাবোধ করেনি।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত অপর হাদীসে রয়েছে- একদা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু

আনহু ইয়ামেন হতে কিছু স্বর্ণের টুকরো নবী করীমের খিদমতে পাঠালে ওই স্বর্ণগুলো নবী করীম উপস্থিত চারজন সাহাবীর মাঝে বন্টন করে দেন। এতে একলোক বলল, এর হকদার আমরাও তো ছিলাম। এ কথা নবী করীমের কানে পৌঁছলে তিনি বললেন- তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে করোনা? অথচ আসমানের ফেরেশতারা পর্যন্ত আমাকে 'আমীন' বলে জানে। অতঃপর একলোক দন্ডায়মান হল, যার চক্ষুযুগল ছোট ছোট গর্তের মত ভিতরে ঢুকানো, মুখের চোয়াল দুটো ফুলানো, কপাল উঁচু, ঘনশ্মশ্রুমন্ডিত আর মাথাটা ছিল সম্পূর্ণ মুন্ডানো; সে বলল- হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। তার দুঃসাহসিক কথা শুনে নবী করীম প্রচন্ড রাগস্বরে বললেন, তুমি ধ্বংস হয়ে যাও। আমি কি আল্লাহ্‌কে দুনিয়ার সব লোকের চেয়েও বেশি ভয়কারী নই? অতঃপর লোকটি যখন মজলিস হতে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবেদন করলেন, এয়া রসূলাল্লাহ্! আমি কি এ ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেব? নবী করীম তাঁকে বারণ করলেন এবং বললেন এ লোকের ঔরশে এমন কিছু লোক জন্ম নেবে যারা ক্বোরআন তিলাওয়াতে সব সময় মুখ ভিজিয়ে রাখবে ঠিকই কিন্তু ক্বোরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে নিচের (ক্বলবের) দিকে যাবে না। এরা দ্বীন, ধর্ম থেকে এমনিভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক হতে তীর বের হয়ে যায় আর ফিরে আসেনা।

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত নবী করীম এও বলেছিলেন যে, ''তোমরা এদেরকে পৃথিবীর বুকে যেখানে পাও সামূদ গোত্রের মত হত্যা কর।''

[দ্রষ্টব্য-বুখারী শরীফ : কিতাবুল মাগাযী, মুসলিম শরীফ : কিতাবুয্ যাকাত, মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবনে হিবান, মুসনাদে আবী ইয়ালা, হিলিয়াতুল আউলিয়া, ফাতহুল বারী : কৃত ইমাম আসক্বালানী, আদ্ দীবাজ : কৃত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আস্ সারিমুল মাসলুল কৃত: ইবনে তাইমিয়া ইত্যাদি]

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, অপর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, একদা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। এমতাবস্থায় 'যুল খুয়াইসরাহ' নামক এক ব্যক্তি বলে ওঠল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি ইনসাফ (ন্যায়বিচার) করুন। এ কথা শুনে নবী করীম বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। আমি ইনসাফ না করলে দুনিয়াতে আর কে ইনসাফ করবে? এদিকে হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে আবেদন করলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি এ ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দিই। নবীজী তাঁকে বারণ করে বললেন, তার কিছু অনুসারীও রয়েছে। তারা এত বেশি নামায পড়ে যে, তাদের নামাযের সামনে তোমরা তোমাদের নামাযকে অতি নগণ্য মনে করবে, তারা এতবেশি রোযা রাখে যে, তাদের রোযার সামনে

তোমাদের রোযা যেন কিছুই না। অথচ তারা দ্বীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক হতে বের হয়ে যায়।

-[সহীহ বুখারী : কিতাবুল আদব : হাদীস-৫৮১১, সহীহ মুসলিম : বাবু যিক্‌রিল খাওয়ারেজ ওয়া সেফাতিহিম]

এভাবে প্রসিদ্ধ সকল হাদীসের কিতাবে খারেজীদের আলামত, ভ্রান্ত আক্বীদা ও চরিত্র সম্পর্কে উল্লেখ পূর্বক হাদীস শরীফসমূহ সঙ্কলন করা হয়েছে। সেগুলোর আলোকে সংক্ষেপে এতটুকুই বলতে হয়, ইসলামের নামে গজে ওঠা বাহাত্তর বাতিল মতবাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও মারাত্মক দল হল- 'খারেজী'। এরা দুর্দান্ত প্রতাপের সাথে চলাফেরা করত, এমনকি ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত মাওলা আলী মুরতাদ্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শহীদ করেছিল এরাই। শুধু তা-ই নয়, মা আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আন্হা ও হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যকার উষ্ট্রযুদ্ধের সূচনার নেপথ্যে এদেরই ষড়যন্ত্র ছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তদ্রূপ সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের মূল কারণও ছিল এদের মুনাফিক্বী। এভাবে ইসলামের সুশোভিত বাগানকে তছনছ করে দিতে চেয়েছিল এই কুখ্যাত খারেজী মতবাদীরা। কিন্তু আল্লাহ্‌র দ্বীন তিনিই হিফাযত করেছেন। আর ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে সে সব বাতিল মতবাদীরা। সবার সামনে উন্মোচিত তাদের মুখোশ। সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করে হাজার হাজার লোক তাদের দলত্যাগ করে ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পতাকাতলে সমবেত হয়ে নিজেদের ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণে সচেতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ইবলিস শয়তানতো আর বসে নেই। ওই সমস্ত নিগৃহিত অভিশপ্ত খারেজীদেরকে অন্যনামে কীভাবে পৃথিবীর বুকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তার পরিকল্পনা নিয়ে যেন মাঠে নেমেছে।

তাইতো দেখা যায়- খারেজীদের চরিত্র আক্বীদা-বিশ্বাস ও বাহ্যিক লেবাস, লোকদেখানো আমলের বাহার আর অন্তর নবীবিদ্বেষের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। খারেজীর মত মাথামুণ্ডানো তাদের অন্যতম চরিত্র, নবী করীমের প্রতি তা'যীম-শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে করা যারা শির্ক ফত্ওয়া দেয়, মিলাদ-ক্বিয়ামকে যারা বিদ্'আত মনে করে, নবীকে নিজেদের মত সাধারণ মানুষ বলতে যাদের বুক কাঁপেনা, আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে সক্ষম এমন ঈমানবিধ্বংসী আক্বীদা যাদের কলমে ও বয়ানে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ পায়। নবী-রসূল ওলী-আউলিয়া কেরামের শানে অসংখ্য সহীহ হাদীসকে যারা প্রত্যাখ্যান করার দুঃসাহস দেখায়, এরা কারা? মুখে মধু, অন্তরে যেন বিষ। কথাবার্তা যাদের নবীদের মত, কাজকর্ম ফির'আউনের মত, আর অন্তর বাঘের ন্যায় হিংস্রতর বলে হাদীসে পাকে নবী করীম এদের কথাই বলেছিলেন সত্যিই এরা সুন্দর সূরে ক্বোরআন পড়ে, আমলের পাহাড় যেন মাথায় কাঁধে নিয়ে

ঘুরে বেড়াচ্ছে এখান থেকে ওখানে, শহরে-বন্দরে নগরে ও গ্রামে-গঞ্জে। এরা ঘন ঘন মাথা মুণ্ডায় কেন? কিংবা এদের মতাদর্শ প্রচারের কেন্দ্র খারেজী (কওমী) মাদরাসার ছাত্রদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে মাথা মুণ্ডাতে হয়, তার পেছনে রহস্য কী? তাহলে এরাই যে, ওহাবী, খারেজী, কওমী, তাবলীগী একই সূত্রে গাঁথা নবী দুশমনদের অনুসারী কিংবা সদস্য তা বলতে দ্বিধা নেই। যারা নবীর ইল্‌মকে শয়তান, পাগলের ইলমের সাথে তুলনা করতে পারে, নামাযে নবী পাকের খেয়াল আসাকে গরু-গাধার খেয়াল আসার চেয়েও মন্দ বলতে পারে, তাদের মাঝে আর সেই খারেজী মতবাদের প্রবক্তা 'যুল খুয়াইসারা'র মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বরং সেই অভিশপ্ত 'যুল খুয়াইসারা'র অসমাপ্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যই এদের আত্মপ্রকাশ।

পরিশেষে, বলতে চাই, বাহ্যিক চাকচিক্য ও আমলের বাহার, লোক দেখানো লম্বা দাঁড়ি, পাগড়ি, মিসওয়াক ইত্যাদি দেখে কেবল যেন আমরা বিভ্রান্ত না হই; বরং তাদের মৌলিক আক্বীদা কি রসূলের প্রদর্শিত পথে না বিপথে তা যাচাই, বাছাই করা বর্তমান ফিত্‌নার যুগের প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। কারো মুখে ধর্মের বুলি শুনতেই তার পেছনে বলে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না। ক্বিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ঈমান ও কৃতকর্মের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। তাই সময় থাকতেই সতর্ক হতে হবে। বিশুদ্ধ রাখতে হবে কিংবা করে নিতে হবে নিজেদের ঈমান-আক্বীদা।

--><--

নবীপ্রেমের বাস্তব প্রতিচ্ছবি সিদ্দীক্ব-ই আকবর

[রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ بَيْنَا رَأْسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حِجْرِىْ فِىْ لَيْلَةٍ ضَاحِيَةٍ اِذْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ يَكُوْنُ لِاَحَدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ نُجُوْمِ السَّمَآءِ قَالَ نَعَمْ عُمَرُ قُلْتُ فَاَيْنَ حَسَنَاتُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ اِنَّمَا جَمِيْعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ اَبِىْ بَكْرٍ

অনুবাদ

হযরত আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক পুর্ণিমা রাতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মাথা মুবারক আমার কোলে রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমি জানতে চাইলাম এয়া রসূলাল্লাহ্! আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যার পরিমাণ ইবাদত কারো নিকট আছে কি? নবী করীম জবাবে বললেন, ''হ্যাঁ। ওমরের নিকট আছে।'' আমি বললাম, ''তাহলে (আমার আব্বাজান) আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইবাদত (আমল) গেল কোথায়?'' নবী করীম বললেন, ''ওমরের সমস্ত ইবাদত আবূ বকরের একটি মাত্র ইবাদতের সমান।'' -[সূত্র: মিশকাত শরীফ : ৫৬০ পৃষ্ঠা]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে ইসলামের মহান ত্রাণকর্তা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মর্যাদা তথা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয়হাবীবের নিকট অবস্থান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হল সমস্ত নবীর পরে সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। মহান আল্লাহর উপর অগাধ ভরসা নবী করীমের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ইবাদতে একাগ্রতা তাকে মহান মর্যাদার অধিকারী বানিয়েছে।

ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি সারাক্ষণ থাকতেন নবী করীমের সাথে। ইতিপূর্বেকার অর্থসম্পদ যা ছিল সবক'টি বিলিয়ে দিয়েছেন ইসলামের খিদমতে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অল্প দিনেই মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

ক'দিন যেতে না যেতেই হযরত উসমান, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস, হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে চলে আসেন। -[সূত্র: যারক্বানী আলাল মাওয়াহেব : ১ম খণ্ড : ১৪৬ পৃষ্ঠা]

ইসলামের প্রচার-প্রসারে হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তেমনি অসাধারণ আত্মত্যাগ ও উৎসর্গও করেছেন অনেক ধন-সম্পদ। একদা মসজিদে হারামের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদের সামনে ইসলামের দাওয়াত ঘোষণা করতেই হতভাগা কাফির-মুশরিকরা চতুর্দিক হতে তাঁর উপর বৃষ্টির ন্যায় পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। ফলে তিনি আঘাতে জর্জরিত হয়ে রক্তাক্ত শরীরে মাটিতে ঢলে পড়লেন। এক পর্যায়ে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। স্বীয় গোত্রের কিছু লোক এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে গেলে অনেক্ষণ পর তার হুঁশ ফিরে আসে। হুঁশ ফিরে আসতেই তিনি জানতে চাইলেন- আল্লাহর রসূল কেমন আছেন? সিদ্দীক্ব-ই আকবরের এ অসাধারণ আত্মত্যাগ ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

তিনি তার নিজের সম্পদ দিয়ে অনেক ক্রীতদাসকে ক্রয় করে আযাদ করে দিয়েছিলেন। যেমন হযরত বেলাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে উমাইরা বিন খলফের কাছ থেকে, হযরত আমের বিন ফুহাইরাকে তোফাইল বিন আবদুল্লাহর কাছ থেকে হযরত আবুল ফক্বীহকে সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছ থেকে, হযরত লুবাইনা ও হযরত জুনাইদাহকে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে (তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি) ক্রয় করে আযাদ করে দিয়েছিলেন। এভাবে হযরত নাহ্দিয়া, উম্মে উবাইসহ আরো অনেক গোলাম-বাঁদী আযাদ করার কথা ইতিহাসে স্বীকৃত রয়েছে। পরবর্তীতে ওই সমস্ত আযাদকৃত গোলামরাই নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ইসলাম প্রচারে সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন। তাই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সেই উৎসর্গ ও ত্যাগের সাথে অন্য কারো ত্যাগের তুলনা হয়না। এ প্রসঙ্গে নবী করীম এরশাদ করেন-

مَانَفَعَنِىْ مَالُ اَحَدٍ قَطُّ مَانَفَعَنِى مَالُ اَبِىْ بَكْرٍ

অর্থাৎ: ''আবূ বকরের সম্পদ দ্বারা আমার যা উপকার হয়েছে, অন্য কারো সম্পদ দ্বারা আমার ততটুকু উপকার হয়নি।'' -[তিরমিযী শরীফ]

অর্থ সম্পদ, দান, কায়িক পরিশ্রম নয় শুধু, বরং ইসলামের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতেও তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত। নবীপ্রেমের মূর্তপ্রতীক ছিলেন হযরত

আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ
مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْن

অর্থাৎ: ''তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট অধিক প্রিয় হবনা তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, মানুষ ও অন্যান্য সবকিছু থেকে।'' -[বুখারী শরীফ : ১ম খন্ড : ৭ পৃষ্ঠা]

অন্য হাদীসে রয়েছে, আল্লাহর প্রিয় রসূল এরশাদ করেছেন-

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ
حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهٖ

অর্থাৎ: ''ওই সত্ত্বার শপথ! যাঁর (কুদরতী) হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হব।''

[মুসনাদে ইমাম আহমদ ৪র্থ খন্ড ৩৩৬ পৃষ্ঠা, মুসতাদরাক, তাবরানী]

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তাইতো তাবূক যুদ্ধের সময়ে নবী-ই আকরামের নির্দেশ বাস্তবায়নে ঘরের যা কিছু ছিল সবক'টি নবী পাকের কদমে এনে হাযির করে দিয়েছিলেন। আর নবী করীম জিজ্ঞেস করেছিলেন- আবূ বকর মনে হয় তুমি সব কিছু নিয়ে এসেছ; কিন্তু তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ? জবাবে সিদ্দীক্ব-ই আকবর বলেছিলেন- আমি আমার পরিবার- পরিজনের জন্য আল্লাহ্ এবং রসূলকে রেখে এসেছি। -[মিশকাত : ৫৫৬ পৃষ্ঠা]

এভাবে প্রতিটি কাজেই তিনি প্রথমে এগিয়ে থাকতেন। অন্য সাহাবীদের জন্য তিনি ছিলেন অনুকরণীয় আদর্শ। অন্য সাহাবা-ই কেরাম কোন দিনই পেরে ওঠতেন না ইবাদত- বন্দেগীতে, না দানশীলতায়, না অন্যান্য কাজ-কর্মে। সব সময়ই তিনিই প্রথম স্থান দখল করে রাখতেন।

একদা নবী-ই আকরাম সমবেত সাহাবা-ই কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমাদের মধ্যে আজ কে রোযা রেখেছে? হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন- হুজূর আমি! অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজকে জানাযায় শরীক হয়েছে? হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন- হুজূর! আমি। এবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজকে মিসকীনকে খাবার

দিয়েছে? এবারও সিদ্দীক্ব-ই আকবর এগিয়ে গেলেন, হুযূর! আমি। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আজ কে রোগীর সেবা করেছে? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হুজূর ! আমি রোগীর সেবা করেছি। এবার নবী হুযূর করীম এরশাদ করলেন, এতগুলো গুণ যে ব্যক্তির মধ্যে একত্রে পাওয়া গেল সে বেহেশ্‌তে যাবে। -[মুসলিম শরীফ : কিতাবুয্ যাকাত ও সুনানি নাসাঈ]

বহুমুখী গুণে গুণান্বিত মহান ব্যক্তিত্ব হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন খোলাফা-ই রাশিদীনের প্রথম খলীফা। আর খোলাফা-ই রাশেদীন হলেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মডেল। যেমন- হাদীস শরীফে নবী করীম এরশাদ করেছেন-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ

অর্থাৎ: ''তোমাদের উপর আমার সুন্নাত ও খোলাফা-ই রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা আবশ্যক।''

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সিদ্দীক্ব-ই আকবর হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র আদর্শ অনুসরণের তাওফীক্ব দান করুন; আমীন।

--><--

কদমবুচি শুধু জায়েয নয়, সুন্নাতে সাহাবাও

عَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِىْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لما قدمنَا المَدِيْنَة وَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلَ يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلَه

অনুবাদ

হযরত যোরা' রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যিনি আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনা শরীফে আগমন করলাম, তখন আমাদের বাহন হতে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হস্ত মুবারক এবং কদম মুবারক চুম্বন করলাম। -[আবূ দাউদ শরীফের সূত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ্ ৪০২ পৃষ্ঠা]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইসলাম সুন্দরতম একটি আদর্শের নাম। ইসলামের শিষ্টাচারিতা অতি চমৎকার। ছোট-বড় সকলের প্রাপ্য অধিকার, সম্মান, স্নেহ, আদব, ভালবাসা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সুন্দর আচরণের যে শিক্ষা ইসলামে দেয়া হয়েছে -তা অন্য কোন ধর্মে দেখা যায় না। বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ لَّمْ يَرْحَمَ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থাৎ যে বড়কে সম্মান করেনা এবং ছোটকে স্নেহ করেনা সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নবী-ই করীমের শিক্ষা। সম্মান প্রদর্শন বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন সালাম প্রদান, দেখলে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া, কাজকর্মে সহযোগিতা করা, প্রয়োজনীয় বস্তু এগিয়ে দেয়া, পর সাক্ষাৎ হলে কিংবা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাওয়ার প্রাক্কালে কদমবুচি করা।

বড়দের মধ্যে রয়েছে- মা-বাবা, শিক্ষকমণ্ডলী, দাদা-দাদী, নানা-নানী, খালা-খালু, ফুফা-ফুফু, চাচা-চাচী, মামা-মামী, বড় ভাই, বড় বোন ইত্যাদি মুরব্বীদের কাছ থেকে দো'আ নেয়ার অন্যতম পন্থা হল সালাম বিনিময়ের পর কদমবুচি করা। এ কাজটি অত্যন্ত চমৎকার একটি শিক্ষা, যাতে করে শিশুরা মুরব্বীদের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী হয়ে গড়ে উঠে।

অনেকে এ কদমবুচি নাজায়েয মনে করে, এমনকি মুরব্বীদেরকে কদমবুচি করা

হারাম, শির্ক ইত্যাদি ফতোয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করেনা। মূলত পবিত্র কোরআন-হাদীসের দলীল ছাড়া এ ধরনের লাগামহীন বক্তব্য দ্বারা নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্তির শিকার হয়। আর সমাজ হয় শিষ্টাচার বঞ্চিত, ছোটদের মনে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা কমতে থাকে। তাই যুগ যুগ ধরে চলে আসা সুন্দরতম আদব-কায়দার অন্যতম পন্থা যে কদমবুচি ইসলামী শরীয়তে কতটুকু অনুমোদিত তা পাঠকসম্মুখে উপস্থাপনই এ প্রয়াস। নিম্নে কদমবুচির বৈধতার উপর আরো কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করা হল:

হযরত ওয়াযে ইবনে আমের রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা আমরা হুজূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে উপস্থিত হলাম فَاَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا অর্থাৎ আমরা হুযূরের পবিত্র হাত এবং চরণযুগল ধরে চুম্বন করলাম। -আদাবুল মুফরাদ : ১৪৪ পৃষ্ঠা

হযরত বুরাইদা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

سَأَلَ اَعْرَابِىٌّ النَّبِىَّ ﷺ اٰيَةً فَقَالَ لَهٗ قُلْ لِتِلْكَ الشَّجَرَةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْكِ فَقَالَ فَمَالَتِ الشَّجَرَةُ عَنْ يَمِيْنِهَا وَشِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفِهَا فَقَطَعَتْ عُرُوْقَهَا ثُمَّ جَآئَتْ يَتَّخِد الْاَرْضَ تَجُرُّ عُرُوْقَهَا مغبرة حتي وَقَعَتْ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاَعْرَابِىُّ مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ اِلٰى مَنْبَتِهَا فَرَجَعَتْ فَدَلَّتْ عُرُوْقَهَا فَاِسْتَوَتْ فَقَالَ الْاَعْرَابِىَ اِئْذَنْ لِىْ اَسْجُدُ لَكَ قَالَ لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا قَالَ فَاْذَنْ لِىْ اَنْ اُقَبِّلَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ فَاَذِنَ لَهٗ

অর্থাৎ- একজন বেদুঈন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কাছে মু'জিযা চাইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেদুঈনকে এরশাদ করলেন, ওই বৃক্ষটাকে বলো আল্লাহ্‌র রসূল তোমাকে ডাকছেন। সে যখন বললো, বৃক্ষটা তার ডানে-বামে, সম্মুখে, পেছনে ঝুঁকল, তখন ওটার শেকড়গুলো ভেঙ্গে গেলো। তারপর তা মাটি খোদাই করে শিকড়গুলো টেনে ও বালি উড়িয়ে হুজূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মুখে এসে দাঁড়াল এবং বলল- ''আস্‌সালামু আলায়কা এয়া রসূলাল্লাহ!'' বেদুঈন বললো, ''আপনি তাকে

আদেশ করুন যেন এটা ওখানে ফিরে যায়।'' তাঁর নির্দেশে ওটা ফিরে গেল এবং তার শেকড়গুলোর উপর গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বেদুঈন বললো, ''আমাকে অনুমতি দিন আমি আপনাকে সাজদা করবো।'' তিনি এরশাদ করলেন, ''যদি কাউকে সাজদাহ্ করার হুকুম দিতাম তাহলে নারীকে হুকুম দিতাম সে যেন তার স্বামীকে সাজদা করে।'' বেদুঈন আরজ করলো- ''হুযূর তাহলে আমাকে আপনার হস্ত ও পদদ্বয় চুম্বন করার অনুমতি দিন।'' তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করলেন।

-শিফা শরীফ, দালাইলুন্নুবূয়্যাহ, আবূ না'ঈম পৃষ্ঠা-৩৩২

কসীদায়ে বুরদা শরীফে আছে-

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْاَشْجَارُسَاجِدَةً

تَمْشِىْ اِلَيْهِ عَلٰى سَاقٍ بِلاَ قَدَمٍ

অর্থাৎ- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আহবানে বৃক্ষরাজি সাজদাকারী অবস্থায় চলে আসলো। তাঁর দিকে, পা ছাড়া, গোচা (কাণ্ড)'র পর উপর ভর করে চলে আসলো। [ক্বসীদাহ্-ই-বুর্দাহ্]

হযরত সোহাইব রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

رَأَيْتُ عَلِيًا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَ رِجْلَيْهِ

অর্থাৎ আমি হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখেছি, তিনি হযরত আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র হাতে ও পায়ে চুমু দিচ্ছেন।

-[বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ, পৃষ্ঠা-১৪৪]

হযরত ইবনে জাদ'আন রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত সাবিত রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলেছেন-

اَمَسَسْتَ النَّبِى ﷺ بِيَدِكَ قَالَ نَعَم فَقَبَّلَهَا

অর্থাৎ আপনি কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আপনার হাত দ্বারা স্পর্শ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁর হাতে চুম্বন করলেন। -[বুখারী ফিল আদাব : পৃষ্ঠা-১৪৪]

প্রমাণিত হল- ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনার্থে বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে ও পায়ে চুম্বন করা শুধু জায়েযই নয়, বরং সুন্নাত সম্মত।

কতেক লোক বুযুর্গানে দ্বীনের হাত ও পায়ে চুমু খাওয়াকে শির্ক, পূজা ইত্যাদি বলে থাকে। উল্লেখিত বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ তাদের ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা উচিত। যদি হস্ত ও পদ চুম্বন করা শির্ক হতো তাহলে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনোই তা করার অনুমতি প্রদান করতেন না। প্রতীয়মান হলো- হস্ত ও পদচুম্বন করলেও সম্মান প্রদর্শনার্থে শির্ক কিংবা পূজা নয়। যদি এটাকে শির্ক

বলা হয়, তবে কি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি শির্ক করার অনুমতি প্রদান করেছেন? এবং সাহাবায়ে কেরামের দ্বারা কি শির্ক সংঘটিত হয়েছে? (না'ঊযু বিল্লা-হ্!) এর কোনটিই হতে পারে না।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে দ্বীন সহকারে প্রেরিত হয়েছেন, তার (দ্বীন) মৌলিক শিক্ষাই হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

যেহেতু বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ এবং সাহাবা-এ কেরামের পবিত্র জীবনে কদমবুচি তথা সম্মান প্রদর্শনার্থে বুযুর্গানে দ্বীনের হাত ও পা চুম্বন করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাই বলা যায়- কদমবুচি করা কোন গর্হিত কাজ তো নয়ই, বরং এটা একটি বরকতময় আমল। কদমবুচি শির্ক বলে যারা ফিতনা- ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে তারা বলে বেড়ায় কারো সামনে মাথা নিচু করাই সাজদাহ্ আর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাজদাহ্ করা হারাম; তাই কদমবুচিও হারাম। অথচ তাদের জানা দরকার, রুকু'ও সাজদার জন্য নিয়্যত আবশ্যক। যেহেতু কদমবুচির ক্ষেত্রে কোন মুসলমানের অন্তরে কষ্মিণকালেও সাজদাহ্ করার নিয়্যত থাকেনা, সেহেতু কদমবুচি হারাম বলাটা ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির নামান্তর।

পরিশেষে বলতে হয়, মা-বাবা, শিক্ষকমণ্ডলী, পীর- মাশাইখ, বুযুর্গানে দ্বীন এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে কদমবুচি নিঃসন্দেহে একটি বৈধ আমল, যা নতুন প্রজন্মের একটি উত্তম আদর্শও বটে। এতে শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি, স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। আর নবীজী এরশাদ করেছেন- ''তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার না হও এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপরকে ভাল না বাস।'' সুতরাং প্রমাণিত হল- একে অপরের ভালবাসা ঈমানের দাবি ও ঈমানদারের পরিচায়ক। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে আল্লাহ্র রসূলের শেখানো আদর্শ পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন।

আর এ নিবন্ধে একথাও প্রমাণিত হলো যে, সাজদা শুধু আল্লাহরই জন্য। মানুষ-মানুষ কিংবা অন্য কিছুকে কোনরূপ সাজদা করার অনুমতি ইসলাম দেয় না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদতের নিয়্যতে সাজদা করলে তা হবে নিরেট শির্ক। আর তা'যীমের জন্য করলে তা হবে হারাম। আল্লাহ্ বুঝার তাওফীক্ব দিন!! আমীন।

--><--

যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰی ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰی رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ وَمُسْلِمُ وَالنَّسَآئِیُّ

অনুবাদ

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের দিকে অধিক সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না: মসজিদে হারাম, মসজিদে রসূল (মদীনা শরীফের মসজিদে নবভী শরীফ) ও মসজিদে আক্বসা (বায়তুল মুক্বাদ্দাস)।

-(সূত্র: বুখারী শরীফ : কিতাবুল জুমু'আহ, মুসলিম শরীফ : কিতাবুল হজ্জ, নাসাঈ শরীফ : কিতাবুল মাসাজিদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পবিত্র খানায়ে কা'বা তথা মসজিদে হারাম, বায়তুল মুক্বাদ্দাস্ এবং মসজিদে নবভী এ তিনটি মসজিদ বিশ্বের বুকে শ্রেষ্ঠতম মসজিদ। এ মসজিদসমূহের বৈশিষ্ট্য অনন্য। প্রথমত মসজিদে হারাম আল্লাহ্র ঘর, পৃথিবীর প্রথম ঘর এবং পৃথিবীর সকল মসজিদের মূলকেন্দ্র। এসব কারণে মর্যাদাবান আর বায়তুল মুক্বাদ্দাস অসংখ্য নবী-রসূলের স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যময় স্থান এবং এককালের কেবলা হিসেবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

আর মসজিদে নববীর মর্যাদার মূল কারণ হল এটি রসূলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম, সরওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মওজূদাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী হাতে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর বরকতময় জীবনের অসংখ্য ঘটনা প্রবাহের স্মৃতিবিজড়িত সর্বোপরি তাঁর পবিত্র রওজা মুবারকের পরশধন্য।

তিন মসজিদের ফজীলত

এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস শরীফ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِیْ مَسْجِدِیْ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِیْمَا سِوَاه اِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَام وَصَلَاةٌ فِی الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ اَلف صَلَاةٍ فِیْمَا سِوَاهُ.

অর্থাৎ নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''আমার মসজিদে (মসজিদে নবভী) এক নামায পড়া মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে এক হাজার নামায পড়ার চাইতেও উত্তম। আর মসজিদে হারামে (কা'বা ঘর) এক নামায সেটা ব্যতীত অন্য মসজিদে এক লক্ষ নামায পড়ার চাইতে উত্তম।''[সূত্র: ইবনে মাজাহ্ : কিতাবু ইক্বামাতিস্ সালাত ওয়াস্ সুন্নাতি ফীহা : হাদীস-১৪০৬]

হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হাদীস শরীফে রয়েছে নবী করীম এরশাদ করেছেন-''যে ব্যক্তি মসজিদে আক্বসা এবং আমার মসজিদে নামায পড়ে তার জন্য রয়েছে পঞ্চাশ হাজার নামাযের সাওয়াব এবং যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে এক নামায পড়বে তার জন্য রয়েছে এক লক্ষ নামাযের সাওয়াব।

উল্লিখিত হাদীসের আলোকে বুঝা গেল- 'লা তুশাদ্দুর রিহাল' হাদীসের মর্মার্থ হল অধিক সাওয়াবের নিয়্যতে তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর করা যাবে না। সুতরাং অধিক সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়া যদি কেউ সাধারণত যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কিংবা কারো সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে অথবা শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে সফর করে, তাহলে নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং কোন বরকতমন্ডিত মসজিদে কিংবা পবিত্র জায়গায় সফর করা নিঃসন্দেহে জায়েয। যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ, বাগদাদ শরীফ, আজমীর শরীফ, কারবালা, নাজাফ, কূফা, বুখারা ইত্যাদি পবিত্র জায়গায় সফর করা হাদীস শরীফের আলোকে অতি উত্তম আমল বলে প্রমাণিত হয়। যেমন-

যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ

মদীনা শরীফে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র রওযা মুবারক যিয়ারতের ফযীলত অপরিসীম। নিম্নে কয়েকটি হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرِیْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِیْ.

অর্থাৎ-হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে আমার কবর যিয়ারত করে তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় আমার শাফা'আত।

[সূত্র: দারে কুত্বনী : ২য় খন্ড ২৭৮ পৃষ্ঠা, নাওয়াদেরুল উসূল কৃত হাকীম তিরমিযী, শু'আবুল ঈমান : ইমাম বায়হাক্বী, মিযানুল ই'তিদাল : ইমাম যাহাবী, শিফাউস্ সিক্বাম ফী যিয়ারাতি খায়রিল আনাম : ইমাম সুবকী]

অপর হাদীস শরীফে রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ زَارَنِیْ بِالْمَدِیْنَةِ مُحْتَسِبًا کُنْتُ لَهٗ شَهِیْدًا وَشَفِیْعًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে মদীনা মুনাওয়ারা হাজির হয়ে আমার যিয়ারত করবে ক্বিয়ামত দিবসে আমি তার জন্য সাক্ষী হব এবং তার জন্য শাফা'আত করব। [সূত্র: বায়হাক্বী : শু'আবুল ঈমান, সুবকী : শিফাউল আসক্বাম]

হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র মুখে বলতে শুনেছি-

مَنْ زَارَ قَبْرِیْ اَوْ قَالَ مَنْ زَارَنِیْ کُنْتُ لَهٗ شَفِیْعًا اَوْ شَهِیْدًا وَمَنْ مَاتَ فِیْ اَحَدِ الْحَرَمَیْنِ بَعَثَهُ اللّٰهُ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ .

অর্থাৎ যে আমার কবর শরীফ যিয়ারত করে অথবা বলেছেন, আমার যিয়ারত করে আমি তার জন্য সাক্ষী অথবা সুপারিশকারী হব এবং যে দুই হারাম শরীফের একটিতে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামত দিবসে নিরাপদ হিসেবে পুনরুত্থান করাবেন।

মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং শুহাদা-এ কেরাম, সাহাবা-এ কেরাম ও আউলিয়া-এ কেরামের মাযার যিয়ারত করতেন এবং দো'আ করতেন। এ আদর্শ অনুসরণ করতেন সিদ্দীক্ব-এ আকবর হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ফারূক্ব-এ আ'যম হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত উসমান যুন্ নূরাঈন রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুসহ অন্যান্য সাহাবীগণ। এ থেকে প্রমাণিত, আউলিয়া-এ কেরামের মাযার যিয়ারত করা খোলাফা-ই রাশেদীনের সুন্নাত। যেমন- ইমাম আবদুর রাযযাক্ব বর্ণনা করেন-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ کَانَ النَّبِیّ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَاْتِی قُبُوْرَ الشُّهَدَآءِ عِنْدَ رأسِ الْحَوْلِ فَیَقُوْلُ: اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّار. قَالَ وَکَانَ اَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ یَفْعَلُوْنَ ذٰلِکَ

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আত্তাইমী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর শুহাদা-ই কেরামের মাযারসমূহ যিয়ারত করতে যেতেন এবং বলতেন, ''তোমাদের ধৈর্যের

কারণে শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের পরকালীন ঠিকানা কতই উত্তম।'' হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তীতে হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম অনুরূপ আমল করতেন।

হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত-

قَالَ اَبُوْبَکْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِیّ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ اِنْطَلِقْ بِنَا اِلٰی اُمِّ اَیْمَنَ نَزُوْرُهَا کَمَاکَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَزُوْرُهَا

অর্থাৎ-হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলতেন- চলো আমরা উম্মে আয়মান রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার যিয়ারত করে আসি, যেভাবে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর যিয়ারতে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

[সূত্র: মুসলিম শরীফ : ফাজাইলে সাহাবা, ইবনে মাজাহ : কিতাবুল জানাইয, মুসনাদে আবী ইয়া'লা]

এভাবে অসংখ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আউলিয়া-এ কেরামের মাযার শরীফে গমন করা শুধু জায়েযই নয়, বরং সুন্নাতে রসূল, সুন্নাতে সাহাবা ও সুন্নাতে আউলিয়া-এ কেরাম। যেখানে আউলিয়া-এ কেরামের মাযার শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া ফযীলতপূর্ণ ইবাদত, সেক্ষেত্রে মদীনা শরীফে নবী পাকের রওযা মুবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করা কত বেশি ফজীলতপূর্ণ হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মোদ্দাকথা, মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র ক্বোরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন- নবী পাকের দরবারে হাজিরা দিয়ে আমাদের কৃত অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়ে নেয়ার জন্য। যেমন এরশাদ হয়েছে-

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا ৬৪

অর্থাৎ: (হে রসূল!) আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলম্ করে (অপরাধ বা গুনাহ্ দ্বারা আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে) তখন (হে মাহবূব! তারা) আপনার দরবারে হাযির হয়, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই (তারা) আল্লাহ্কে অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পাবে। -সূরা নিসা : আয়াত-৬৪

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হজ্জে বায়তুল্লাহ্ এবং যিয়ারতে মদীনা মুনাওওয়ারা নসীব করুন। আমীন।।

নবীজীর প্রতি জড়পদার্থের সম্মান

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ ﷺ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِىْ بَعْضِ نَوَاحِيْهَا فَمَا اِسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌاِلَّا وَهُوَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَالْحَاكِمُ.

অনুবাদ

হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি মক্কা শরীফে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলাম। আমরা সেখানকার একটি জনপদ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আর চলার পথে পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা সবই যা সামনে পড়েছে সবকিছুই আরয করছিলো, ''আস্ সালামু আলায়কা এয়া রসূলাল্লাহ!'' (হে আল্লাহর রাসূল আপনাকে সালাম!) ।

-[সূত্র: তিরমিযী শরীফ, দারেমী শরীফ ও হাকেম]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের প্রিয়নবী হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কেবল নির্দিষ্ট জাতি, নির্দিষ্ট গোত্র কিংবা নির্দিষ্ট সৃষ্টির জন্য প্রেরিত হন নি; বরং তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি সৃষ্টির জন্য নবী এবং সমগ্র সৃষ্টির জন্য 'রহমত'। তিনি যেমনি মানবজাতির নবী, তেমনি জিন্ জাতির জন্য নবী। জীব-জড় সকল পদার্থের উপর তাঁর নূরানী প্রভাব ও পরিচিতি বিস্তৃত ছিল সমানভাবে। জীব-জানোয়ার, পশু-পাখি আর সাগরের মাছসহ কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত তাঁর বিশাল মর্যাদার ব্যাপারে ওয়াকিফহাল ছিল। তাই চলার পথে এরাও নবী-ই আকরামের সম্মানে ঝুঁকে পড়ত। সালাম করতো, আর তাদের মালিকের ব্যাপারে অভিযোগ করত ইত্যাদি। আলোচ্য হাদীসে পাহাড় ও গাছ-পালার পক্ষ হতে নবী করীমের প্রতি সালাম নিবেদনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

পাহাড়-পর্বত রসূলের আশিক্ব ছিল মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে جَبَلُ اُحُدٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ (উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি)। [বুখারী শরীফ]।

অপর বর্ণনায় রয়েছে, একদা নবী-ই আকরাম খোলাফা-এ রাশিদীনকে সাথে নিয়ে উহুদ পাহাড়ে আরোহন করলে পাহাড় আনন্দে নাচানাচি শুরু করে।

অতঃপর নবী করীম পাহাড়ের উপর লাঠি মুবারকের টেক লাগিয়ে বললেন, ''হে পাহাড় তুমি কি জান, তোমার পিঠের উপর নবী, সিদ্দীক্ব এবং দু'জন শহীদ রয়েছেন।'' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল।

পাহাড় নবীকে চিনত, আর সম্মান করত মর্মে আরো অনেক হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ গাছপালার কথাও। নবী-ই করীমের হাতের ইশারা পেয়ে গাছ আপন জায়গা হতে হেঁটে এসেছে। এর প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার। গাছপালা তাঁর খিদমতে ঝুঁকে পড়ত, সালাম দিত আর সুযোগ পেলে এসে মাথার উপর ছায়া প্রদান করত।

যেমন হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রদ্বিয়াল্লা তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী-ই পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবূ তালেব মক্কার ক্বোরাইশ নেতাদের সাথে ব্যবসার উদ্দেশে সিরিয়া আসা-যাওয়া করতেন। কোন এক সফরে ভাতিজা (নবী করীম) কেও সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে জনৈক রাহিব (পাদ্রী)'র গীর্জার কাছে পৌঁছালে আবূ তালিব যানবাহন থেকে নেমে পড়লেন। অন্যান্যরাও নেমে পড়লেন। এদিকে পাদ্রীও ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। অথচ অন্যান্য সময় এই রাস্তা দিয়ে আবূ তালিব বহুবার যাত্রাবিরতি করেছিলেন, কিন্তু কখনো পাদ্রী ঘর থেকে বের হননি এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাতও করেননি। হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বলেন, লোকেরা তাদের মালামাল ঘুছিয়ে নিচ্ছিল। এমতাবস্থায় পাদ্রী তাদের মধ্যখান দিয়ে হেঁটে সরাসরি রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হাত মুবারক ধরে বলে উঠলেন, ''ইনিই সাইয়্যিদুল আলামীন (বিশ্বজগতের সর্দার)! ইনিই আল্লাহর রসূল!! যাঁকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন রহমাতুল্লিল আলামীন করে প্রেরণ করেছেন।'' ক্বোরাঈশ-নেতারা জিজ্ঞেস করল, আপনি এসব কিভাবে জানলেন? উত্তরে পাদ্রী বললেন, আপনারা যখন জনপদ দিয়ে আসছিলেন তখন পথের সকল গাছপালা ও পাথর সাজদাবনত হয়ে পড়েছিল, এরা কেবল এই নবীর সম্মানেই সাজদাবনত হচ্ছিল। আর আমি তাঁর মোহরে নুবূয়্যত দেখেই তাঁকে চিনেছি। এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে ফিরে গিয়ে খাবার তৈরি করে সবার জন্য খাবার নিয়ে আসলেন। তখন নবী করীম উটের চারণক্ষেত্রে ছিলেন। পাদ্রী বললেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে আসুন। অতঃপর নবী করীম এগিয়ে আসছিলেন। তখন মাথার উপর মেঘমালা ছায়া প্রদান করছিল। এক পর্যায়ে যখন লোকদের নিকট চলে আসলেন দেখা গেলো- সকল লোক গাছের ছায়াতলে। কিন্তু নবীজী যখন এসে বসলেন, তখন গাছের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ল। পাদ্রী উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, দেখুন গাছের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আরো বললেন, আমি আপনাদেরকে

কৃসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের মধ্যে তাঁর অভিভাবক কে? সবাই বলল, ‘‘আবূ তালেব।’’ পাদ্রী আবূ তালেবকে বিভিন্নভাবে বাধ্য করলেন যেন, তাঁর ভাতিজাকে (নবী করীমকে) সামনে না এগিয়ে নিয়ে বাড়িতে ফিরে যান। -[সূত্র: তিরমিযী, মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বা, সহীহ ইবনে হিব্বান, দালা-ইলুন্ নুবূয়্যত, তারিখে তাবারী ইত্যাদি।

এভাবে বিভিন্ন জীব-জানোয়ারও হুজূরের অনুগত ছিল এবং তারা নবী-ই করীমের কথা বুঝত। আর নবী-ই আকরামও তাদের কথাবার্তা বুঝতেন এবং তাদের আবেদন শুনতেন।

হযরত বুরায়দা রদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বলেন, জনৈক আনসারী সাহাবী হুজূরের খিদমতে এসে আরয করলেন, এয়া রসূলাল্লাহ্! আমাদের কাছে একটি উট আছে, সে কঠোরভাবে আক্রমণ করে এবং কারো সাধ্য নেই যে, সেটাকে লাগাম পরাবে। এ কথা শুনে নবী করীম ওঠে দাঁড়ালেন। আমরাও দাঁড়ালাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে চললেন, উটের ঘরে। আর দরজা খোলা মাত্রই নবী করীমকে দেখেই দুরন্ত উট মুহূর্তের মধ্যে শান্ত হয়ে গেল আর অবনত মস্তকে এগিয়ে এসে তাঁর নূরানী চরণযুগলে সাজদা করল আর মাথা মাটিতে ফেলে রাখল। হুযূর নিজ হাত উটের মাথার উপর বুলিয়ে দিলেন আর রশি গলায় পরিয়ে মালিকের হাতে সোপর্দ করলেন। এ ঘটনা দেখে হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, এয়া রসূলাল্লাহ্! নিশ্চয় উট চিনতে পেরেছে আপনি আল্লাহর রসূল। হুযূর জবাবে এরশাদ করলেন, হ্যাঁ! মানব-দানবের কাফিরগণ ছাড়া সৃষ্টিজগতের সকল কিছুই জানে আমি আল্লাহ্র রসূল। -[দালাইলুন্নুবূয়্যত ৩২৬ পৃষ্ঠা, খাসাইসে কুবরা ২য় খণ্ড ৫৮পৃ, যিক্‌রে জামীল]

মুসলমান দাবি করেও যারা রসূলে পাকের শান-মান উপলব্ধি করতে পারেনা কিংবা মানতে চায়না তারা চতুষ্পদ জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট।

হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা হুজূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারীর বাগানে তাশরীফ নিয়ে যান। সঙ্গে ছিলেন হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও কয়েকজন সাহাবী। আর সেই বাগানে ছিল অনেক ছাগল। হুজূরকে দেখামাত্রই ছাগলগুলো দৌঁড়ে এসে একযোগে সাজদায় পড়ে গেল। এ অবস্থা দেখে হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন-

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَحْنُ اَحَقُّ بِالسُّجُوْدِلَکَ مِنْ هٰذِهِ الْغَنَمِ. قَالَ اِنَّهٗ لَاينْبَغِیْ مِنْ اُمَّتِیْ اَنْ يَّسْجُدَ اَحَدٌ لِّاَحَدٍ وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِیْ اَنْ يَّسْجُدَ اَحَدٌ لِّاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

অর্থাৎ: এয়া রসূলাল্লাহ্! এই ছাগলগুলোর চেয়ে আমরাই আপনাকে সাজদাহ্ করার ব্যাপারে অধিক হক্বদার। জবাবে হুজূর এরশাদ করলেন, আমার উম্মতের মধ্যে একে অপরকে সাজদাহ্ জায়েয নেই। যদি একে অপরকে সাজদা করা জায়েয হত তাহলে আমি প্রত্যেক স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম যেন তার স্বামীকে সাজদা করে।

-[সূত্র:‘দালা-ইলুন্ নুবূয়ত’ ৩২৭পৃষ্ঠা, ‘খাসা-ইসে কুবরা’ ২য় খণ্ড ৬১ পৃ, ‘যারক্বানী আলাল মাওয়াহিব’ ৫ম খণ্ড ১৪২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি]

উপরিউক্ত বিষয়ে আরো কয়েকটি হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। যার আলোকে ইমামে আহ্লে সুন্নাত আ’লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান ব্রেলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফতোয়া দিয়েছেন, ‘‘আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করা হারাম।’’

-[আয্ যুবদাতুয্ যাকিয়্যাহ্]

উল্লিখিত হাদীসের শিক্ষা হলো পাহাড়-পর্বত, গাছপালা জড় পদার্থ হওয়ার পরও নবী-ই আকরামের প্রতি সালাম প্রদানে তৎপর। সে ক্ষেত্রে আমরা মানবজাতি হয়ে নবীর উপর দুরূদ-সালামে অবহেলা করলে কিংবা অযৌক্তিক আপত্তি তুললে তা কেবলই হাস্যকরই নয়; বরং রীতিমত নবীদ্রোহীতা। দ্বিতীয়তঃ কোন মানুষ কোন মানুষ কিংবা অন্য কিছুকে সাজদা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলেও প্রমাণিত হলো। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদতের নিয়্যতে সাজদা করাতো নীরেট শির্ক। আর সম্মানের উদ্দেশ্যে সাজদা করা হারাম, কবীরা গুনাহ্। তা এ ব্যাপারে সবাইকে সাবধান হওয়া চাই। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান সমাজের এক শ্রেণীর লোক কীভাবে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর থেকে নবীপ্রেম ছিনিয়ে নেবে এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে তারা কর্মসূচি হাতে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। মহান আল্লাহ্ আমাদের অন্তরকে খোদাভীতি ও নবীপ্রেমে পূর্ণ করে দিন। আমীন।

--><--

কবরের উপর ফুল ছিটানো

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاس ﷺ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِقَبرَيْنِ يُعَذَّبَان فَقَالَ اِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَايُعَذَّبَان فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لايَسْتَتِرُمِنَ الْبُوْلِ وَاَمَّا الْاَخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رُطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبرٍ وَاحِدَةٍ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا

অনুবাদ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা এমন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে গমন করলেন যাতে আযাব চলছিল। অতঃপর নবী করীম বললেন, বাহ্যিকদৃষ্টিতে বড় ধরনের কোন গুনাহ্র কারণে তাদের আযাব চলছেনা বরং তাদের একজনের অভ্যাস ছিল সে প্রস্রাব থেকে নিজেকে রক্ষা করত না, অপরজন পরনিন্দা করে বেড়াত। অতঃপর নবী-ই আকরাম একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিলেন, আর সেটাকে দু'ভাগ করে দু'কবরে গেড়ে দিলেন। সাহাবা-ই কেরাম আরয করলেন, এয়া রসূলাল্লাহ্! এ কাজটা কি জন্য করলেন? নবীজী জবাব দিলেন, এ জন্য যে, যতদিন ডাল দু'টি তরু-তাজা থাকবে, ততদিন তাদের আযাব হালকা করা হবে।

-(সূত্র: সহীহ বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ১৮২ পৃষ্ঠা কিতাবুল জানা-ইয)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিশ্বজগতের সকল বস্তু স্ব স্ব ভাষা ও অবস্থায় মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে, কিন্তু কেউ কারো তাসবীহ বুঝতে পারে না। ঈমানদার মুসলমানদের কবরের উপর যে সবুজ ঘাস থাকে সেগুলোও আল্লাহর তাসবীহ বর্ণনা করছে এবং সে সব তাসবীহ্র সাওয়াবের কারণে কবরবাসী উপকৃত হয়। যদি কবরবাসী নেক্কার হন, তাহলে তার মর্তবা বেড়ে যায়, আর বদকার গুনাহ্গার হলে এই তাসবীহ্-তাহলীলের বরকতে তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। সুতরাং মুসলমানদের কবর এবং আউলিয়া-এ কেরামের মাযারে পাকে ফুল চড়ানোর উদ্দেশ্যই সেটা।

যেহেতু কবরের উপর ছিটানো ফুল যতক্ষণ তাজা থাকবে ততক্ষণ তাদের পঠিত তাসবীহ- তাহলীল-তাকবীরের বরকত কবরবাসীর কাছে পৌঁছবে। পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّاتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۴۴

অর্থাৎ ''তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে সপ্ত আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যে রয়েছে এবং এমন কোন বস্তু নেই, যা তাঁর প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছে না। তবে তোমরা সেগুলোর তাসবীহ অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।'' -[সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৪৪]

হাদীসের ব্যাখ্যা

আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফাতহুল বারী শরহে বুখারীতে লিখেন-

اِنَّ الْمَعْنٰى فِيْهِ اَنَّهٗ يُسَبِّحُ مَادَامَ رَطْبًا نيخصل التَّخْفِيْفُ بِبَرَكَةِ التَّسْبِيْحِ وَعَلٰى هٰذَا فَيُطْرَدُ فِىْ كُلِّ مَافِيْهِ رَطُوْبَةٌ مِنَ الْاَشْجَارِ وَغَيْرِهَا وَكَذٰلِكَ فِيْمَافِيْهِ بَرَكَةٌ كَالذِّكْرِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ مِنْ بَابِ الْاَوْلٰى .

হাদীসের মর্মার্থ হল- গাছের ডাল-পালা, ফুল কিংবা ঘাস যতক্ষণ তাজা থাকবে ততক্ষণ সেগুলোর তাসবীহ পাঠের বরকতে কবরের আযাব হালকা করে দেয়া হবে। সুতরাং গাছ এবং গাছ জাতীয় (উদ্ভিদ) যাতে সজীবতা রয়েছে যেমন ফুল ইত্যাদি কবরের উপর ছিটানো যাবে। যেহেতু এসব আল্লাহ্র যিক্র করে থাকে। সুতরাং কবরের উপর কোরআন তিলাওয়াত আরো বেশি বরকতপূর্ণ আমল।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফায়জুল বারী'তে লিখেছেন-

فِى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ اَنَّ اِنْبَاتَ الشَّجَرَةِ مُسْتَحَبٌّ وَفِى الْعَالَمْغِيْرِيَّةَ اِنَّ اِلْقَاءَ الرَّيَاحِيْنِ اَيْضًا مُفِيْدً .

অর্থাৎ দুররে মুখতার কিতাবে রয়েছে, কবরের উপর গাছ লাগানো মুস্তাহাব, আর ফত্ওয়া-ই আলমগীরীতে রয়েছে কবরের উপর ফুল ছিটানো উপকারী।

-[সূত্র: ফায়জুল বারী কৃত আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী ২য় খণ্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা কায়রো হতে প্রকাশিত]

আল্ ইমদাদ কিতাবে রয়েছে- ফতোয়ায়ে শামীতে কবরের উপর হতে ঘাস কাটা মাকরূহ বলা হয়েছে। তার কারণ হল যতক্ষণ কবরের ঘাস, ফুল ইত্যাদি তাজা

থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ পড়তে থাকবে এবং সে তাসবীহর কারণে ঐ কবরবাসীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকবে। এর দলীল হলো ওই হাদীস যাতে বর্ণিত হয়েছে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খেজুরের শাখাকে দু'টুকরো করে দু'কবরে গেড়ে দিয়েছিলেন এবং নবী করীম স্পষ্টভাবে এ কথাও বলে দিয়েছিলেন যে, যতক্ষণ গাছের শাখা দু'টি তাজা (কাঁচা) থাকবে ততক্ষণ কবরের আযাব হালকা করা হবে।

উপরিউক্ত বর্ণনা হতে একটা বিষয় আমরা বুঝে নিতে পারি, কবরের উপর ঘাস লাগানো, ফুল ছিটানো মুস্তাহাব। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন- হযরত বুরাইদা আসলামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় কবরের উপর দু'টি গাছের শাখা গেঁড়ে দেওয়ার ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন।

হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন-

وَقَدْ اَفْتَى الْاَئِمَّةُ مِنْ مُتَاَخِّرِىْ اَصْحَابِنَا مِنْ اَنَّ مَا اعْتُقِدَ مِنْ وَضْعِ الرَّيْحَانِ وَالْجَرِيْدَةِ سُنَّةٌ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَاِذَا كَانَ يُرْجَى التَّخْفِيْفُ بِتَسْبِيْحِ الْجَرِيْدَةِ فَبِتِلاَوَةِ الْقُرْاٰنِ اَعْظَمُ بَرْكَةً

অর্থাৎ: আমাদের হানাফী মাযহাবের মুতাআখ্‌খিরীন (পরবর্তী) ইমামগণ ফত্‌ওয়া পেশ করেন যে, কবরের উপর ফুল ছিটানো এবং গাছের ডাল-পালা লাগানোর যে প্রচলন আমরা দেখতে পাই, তা উল্লিখিত হাদীস শরীফের ভিত্তিতে সুন্নাত। সুতরাং বলা যায়, গাছের ডাল-পালার তাসবীহ পাঠের বরকতে যদি কবরের আযাব হালকা হওয়ার আশা করা যায়, তাহলে পবিত্র ক্বোরআন তিলাওয়াতের বরকত কত বেশি হবে, তা সহজে অনুমেয়।

ইমাম নাওয়াভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- উল্লিখিত হাদীসের আলোকে ওলামা-ই কেরাম কবরের পাশে কোরআন তিলাওয়াতকে মুস্তাহাব বলেছেন। কেননা খেজুরের শাখার তাসবীহ দ্বারা যদি কবরের আযাব হালকা হতে পারে, তাহলে (শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র) আল্ ক্বোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কবরের আযাব হালকা হওয়ার আশা করা আরো অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

ইমাম নাওয়াভী আরো বলেন- এ হাদীস শরীফটির আবেদন ব্যাপক। অর্থাৎ এটি কেবল খেজুর ডালার জন্যই খাস নয়। -[সূত্র: শরহে মুসলিম ১ম খন্ড ১৪১ পৃষ্ঠা]

ফতাওয়া-ই আলমগীরীতে রয়েছে-

وَضْعُ الْوَرْدِ وَالرَّيَاحِيْنِ عَلَى الْقُبُوْرِ حَسَنٌ وَاِنَّ التَّصَدُّقَ بِقِيْمَةِ الْوَرْدِ اَحْسَنُ

অর্থাৎ:"গোলাপ কিংবা অন্য কোন ফুল কবরের উপর ছিটানো ভালকাজ এবং ওই ফুলের দাম সাদক্বা করে দেয়া আরো উত্তম।"-[আলমগীরী ৫ম খন্ড ৩৫১ পৃষ্ঠা কোয়েটা হতে প্রকাশিত]

উপরিউক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো মুসলমানদের কবরের উপর ফুল ছিটানো, ঘাঁস লাগানো ইত্যাদি সুন্নাত; এমনকি নবীজীর আমল। যেহেতু এর বিপরীত কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি কিংবা পূর্ববর্ণিত হাদীসকে রহিত করা হয়নি, সেহেতু কোন কালেমা পড়ুয়া মুসলমান এ কাজকে অস্বীকার করতে পারবে না।

তাই যুগ যুগ ধরে আউলিয়া-এ কেরামের মাযারসমূহে ফুল ছিটানোর প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এতে তাঁদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়। আর সাধারণ মুসলমানদের কবরের উপর ছিটানো হলে এতে করে তাদের কবরের আযাব হালকা হয় এবং যিক্‌রের সাওয়াব তাদের আত্মার মধ্যে পৌঁছে। অতএব কাজটা এক দিক দিয়ে যেমন মৃতব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন অপরদিকে তার প্রতি উপকার সাধন।

একদা সাহাবীগণ নবী করীমের কাছে জানতে চাইলেন, মৃতব্যক্তির প্রতি আমাদের কী দায়িত্ব রয়েছে। জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদের দায়িত্ব হল তোমরা তাদের গুনাহ্ মাফ চাইবে এবং তাদের জন্য দো'আ করবে।

উল্লেখিত কাজটা মৃতব্যক্তির জন্য গুনাহ্ মাফ চাওয়ার ধারাবাহিক কার্যক্রম; বরং কেউ কবরের সামনে গিয়ে দো'আ করলে সেটি হবে সাময়িক তথা কিছু সময়ের জন্য। আর কবরের উপর ফুল ছিটিয়ে দিলে সেটা রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহর তাসবীহ পড়বে আর মৃতব্যক্তির রূহে রাত-দিন তার বরকত পৌঁছতে থাকবে।

পবিত্র ক্বোরআন-হাদীসের স্বীকৃত একটি ফযীলতপূর্ণ আমল যুগ যুগ ধরে মুসলিম সমাজে চলে আসলেও সম্প্রতি কিছু বকধার্মিক এই আমলকে অস্বীকার করার প্রয়াস পাচ্ছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এ কাজটা বিদ'আত নাজায়েয শিরক ইত্যাদি ফত্‌ওয়া দেয়ার দুঃসাহস দেখায়।

তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, প্রথমত: কাজটি তথা কবরের উপর ফুল ছিটানো নাজায়েয বলার কোন যুক্তি থাকতে পারে না, কারণ নাজায়েযের পক্ষে ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র কোন দলীল নেই; বরং যা আছে তা পক্ষের। আর শিরক বলাতো একেবারে হাস্যকর। কারণ শির্ক কাকে বলে তা আরেকবার ভেবে দেখার পরামর্শ রইল। তবে যদি বিদ'আত বলা হয়, তাহলে যে কাজটি সর্বপ্রথম নবী করীম নিজেই করলেন, সেই কাজ বিদ'আত হয় কিভাবে? সুতরাং কাজটিকে বিদ'আত বলা হবে নীরেট বোকামী।

আসল কথা বিরোধীতাকারীদের কাজই হলো বিরোধীতা করা। কারণ প্রতিটি

ভালকাজে বিরোধীতা না করলে তাদের গুরু ইবলিস শয়তান যে নারাজ হয়ে যাবে। মূলত আউলিয়া-এ কেরামের মাযারে যারা ফুল ছিটায় তারা মাযার যিয়ারতে বিশ্বাসী তথা আল্লাহর ওলীদের অনুসারী ও ভক্ত। পক্ষান্তরে যারা মাযারে ফুল ছিটানোর বিরোধীতা করে তারা মাযার যিয়ারততো করেই না বরং যিয়ারতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কারণ এরা নবী-ওলীর দুশমন। পবিত্র হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন- ''যে আমার ওলীর সাথে দুশমনী রাখে, আমি (আল্লাহ্) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।'' [বুখারী, মিশকাত-১৯৭ পৃষ্ঠা]

সুতরাং আউলিয়া-এ কেরামের প্রতি যারা বিদ্বেষ পোষণ করে, তারা কেবল ওলীদ্রোহী নয়, বরং খোদাদ্রোহীও। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে খোদাদ্রোহী অপশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করার তাওফীক দান করুন এবং আউলিয়া-এ কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে ধন্য করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন।।

এ হাদীস শরীফ থেকে এ কথারও প্রমাণ মিলে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আলম-ই বরযখ (কবর)-এর অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। কারণ, কবর দু'টিতে যে শাস্তি চলছে তা নবী করীম বলে দিয়েছেন। শুধু তা- নয়, কি কারণে শাস্তি হচ্ছে, এবং কীভাবে ওই লাস্তিকে লঘু করা হবে তাও আমাদের আক্বা ও মাওলা বলে দিয়েছেন। ফলে উম্মত উক্ত দু'টি কাজ সম্পর্কে হয়ে যাবারও সুযোগ পাচ্ছে।

আসুন, আমরা আমাদের আক্বা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহামর্যাদা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করি এবং হুযূর করীমের প্রদত্ত শিক্ষাগুলোকে কাজে পরিণত করতে সচেষ্ট হই। আল্লাহ তাওফিক্ব দিন আমীন!!

--->><---

মি'রাজুন্নবী

সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ نَبِىَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِىَ بِهٖ بَيْنَمَا اَنَا فِى الْحَطِيْمِ .....فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادٰى مُنَادٍ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِىْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِىْ . متفق عليه

বঙ্গানুবাদ

হযরত ক্বাতাদা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক হতে, তিনি মালিক ইবনে সা'সা'আ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে মি'রাজ রজনীর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে যে, আমি হাতিমে কা'বার অংশে শুয়েছিলাম হঠাৎ দেখলাম এক আগন্তুক এসে আমার বক্ষকে এখান থেকে এই পর্যন্ত অর্থাৎ কণ্ঠনালী থেকে নাভী পর্যন্ত বিদীর্ণ করলো। অতঃপর আমার ক্বলব বের করল আর আমার কাছে স্বর্ণের একখানা থালা আনা হলো, যা ঈমান ও বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল। তাতে আমার কলব ধৌত করা হলে আমার কলব ঈমান ও বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। পরিশেষে তা যথাস্থানে রেখে দেয়া হয়। এরপর আমার সামনে আরোহনের একটি জন্তু হাযির করা হয়, যা আকারে খচ্চরের চেয়ে ছোট আর গাধার চেয়ে বড়। তার দৃষ্টি যতদূর যেত সেখানে সে পা রাখত। আমি তার উপর আরোহন করলাম। অতঃপর জিব্রাঈল (আগন্তুক) আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করলেন এমনকি আমরা প্রথম আসমানে পৌঁছে গেলাম। জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম প্রথম আসমানের দরজা খুলতে বললে ভিতর থেকে আওয়াজ এলো, কে? উত্তরে বললেন, আমি জিব্রাঈল। আসমানের ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞেস করল, আপনার সাথে কে? বললেন 'মুহাম্মদ' (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি দাওয়াত করা হয়েছে? উত্তর দিলেন- হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে সাদর সম্ভাষণ, কতই উত্তম তার শুভাগমন। দরজা খুলে দেয়া হল। অতঃপর এখানে দেখা হয়ে গেল হযরত আদম আলায়হিস সালাম এর সাথে। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন, তিনি আপনার পিতা সালাম প্রদান করুন। আমি সালাম দিলাম। আর তিনি জবাব দিয়ে বললেন, পুণ্যবান পুত্র ও পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম আমাকে উপরের দিকে দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন আর দরজা খুলতে বললেন। ভিতর

থেকে জিজ্ঞেস করা হল কে? তিনি বললেন আমি জিব্রাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি দাওয়াত করা হয়েছে? জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন- হ্যাঁ। এবার আওয়াজ এল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ, তাঁর শুভাগমন কতইনা উত্তম ও বরকতময়। এ বলে দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর আমি দ্বিতীয় আসমানে প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ইয়াহ্ইয়া আলায়হিস সালামকে। তারা দু'জন পরস্পর খালাত ভাই। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন, এরা ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা, আপনি তাদের প্রতি সালাম প্রদান করুন। আমি তাদের প্রতি সালাম প্রদান করলাম। তাঁরা উভয়ে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর জিব্রাঈল আমাকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে হাযির হয়ে দরজা খুলতে বললেন, ভিতর থেকে আওয়াজ এল, কে? তিনি বললেন, আমি জিব্রাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল- আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি দাওয়াত করা হয়েছে? জিব্রাঈল বললেন, হ্যাঁ। এবার বলা হল, তাঁকে স্বাগতম, তাঁর শুভাগমন খুবই উত্তম ও বরকতময়। দরজা খুলে দেয়া হল। সাথে সাথে দেখা হয়ে গেল হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস সালাম এর সাথে। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন, ইনি ইয়ূসুফ আলায়হিস সালাম তাঁকে সালাম প্রদান করুন। আমি তাঁকে সালাম প্রদান করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন- পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। এরপর জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম চতুর্থ আসমানে আমাকে নিয়ে গেলেন আর দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি বললেন, জিব্রাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে আছে? তিনি বললেন, আমার সাথে আছেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে আনা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ, তাঁর শুভাগমন কতই উত্তম ও বরকতময়! এই বলে দরজা খুলে দেয়া হল। অতঃপর আমি সেখানে পৌঁছা মাত্রই সাক্ষাৎ হল হযরত ইদ্রীস আলায়হিস সালাম এর সাথে। জিব্রাঈল বললেন, ইনি হযরত ইদ্রীস আলায়হিস সালাম, তাঁকে সালাম প্রদান করুন। আমি সালাম দিলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর জিব্রাঈল আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে গমণ করে পঞ্চম আসমানে পৌঁছেন আর দরজা খুলতে বললে, ভিতর হতে আওয়াজ আসল কে? তিনি বললেন, জিব্রাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। পুনরায় জিজ্ঞেস সরা হল- তাঁকে কি দাওয়াত করা হয়েছে? উত্তরে জিব্রাঈল বললেন, হ্যাঁ। পঞ্চম আসমানের দারোয়ান বললেন, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর

শুভাগমন কতই না উত্তম ও বরকতময়। আমি সেখানে পৌঁছে হযরত হারূন আলায়হিস সালাম এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করলাম। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ইনি হযরত হারূন আলায়হিস সালাম, তাঁকে সালাম প্রদান করুন। আমি সালাম প্রদান করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর জিব্রাঈল আমাকে আরো ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে গেলেন এমনকি ষষ্ট আসমানে গিয়ে পৌঁছেন আর দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেসা করা হল, কে? উত্তরে তিনি বললেন, জিব্রাঈল। পুনরায় জিজ্ঞেসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি উত্তরে বললেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। পুনরায় জিজ্ঞেসা করা হল, তাঁকে কি দাওয়াত করা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ওই ফিরিশতা বললেন, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর শুভাগমন কতই উত্তম ও বরকতময়। আমি সেখানে হযরত মূসা আলায়হিস সালাম এর সাক্ষাৎ পেলাম। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন, ইনি মূসা আলায়হিস্ সালাম, সালাম প্রদান করুন। আমি সালাম প্রদান করলাম। সালামের জবাব দিয়ে তিনি বললেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমার পরে এমন একজন পবিত্র যুবককে (নবীরূপে) পাঠানো হল, যাঁর উম্মতের সংখ্যা আমার উম্মতের সংখ্যার চেয়ে অধিক পরিমাণ বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। অতঃপর জিব্রাঈল আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহন করলেন এবং দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি বললেন, জিব্রাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি দাওয়াত করা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ঐ ফেরেশতা বললেন, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তার শুভাগমন কতই উত্তম ও বরকতময়। সেখানে পৌঁছে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম এর সাথে সাক্ষাৎ হল। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন ইনি আপনার পিতা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম, তাঁকে সালাম প্রদান করুন। নবীজী এরশাদ করলেন, আমি তাঁকে সালাম প্রদান করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুণ্যবান পুত্র ও পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত উঠানো হলো। সিদরা বৃক্ষের ফল ছিল হাজর অঞ্চলের মটকার ন্যায় এবং তার পাতা হাতির কানের ন্যায়। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন, এটাই সিদরাতুল মুনতাহা। সেখানে চারটি নহর ছিল। দু'টি অপ্রকাশ্য অন্য দু'টি প্রকাশ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্রাঈল, এ নহরের তাৎপর্য কী? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য নহর দু'টো হল জান্নাতের দু'টি ঝর্ণাধারা। আর প্রকাশ্য দু'টি হল (মিসরের) নীল ও (ইরাকের) ফোরাত নদী। অতঃপর বাইতুল মা'মূরকে আমার সম্মুখে প্রকাশ করা হল। তারপর আমাকে দেয়া হল একপাত্র শরাব,

একপাত্র দুধ ও একপাত্র মধু। আমি দুধই গ্রহণ করলাম। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বললেন, এটাই স্বভাবজাত ধর্ম (ইসলাম)'র নিদর্শন। আপনি এবং আপনার উম্মত এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। তারপর আমার উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হল। যখন আমি ফিরে চললাম তখন হযরত মূসা আলায়হিস সালাম বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়তে সক্ষম হবে না। খোদার কসম! আপনার পূর্বে আমি লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলের সাথে আমি কঠোর নীতি অবলম্বন করেছি। অতএব, আপনি আপনার রবের কাছে আবার ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য নামায কমিয়ে দেয়ার আবেদন করুন। অতঃপর আমি আবারো আল্লাহর কাছে গেলাম। আমার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক দশ্ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। তারপর আমি মূসা আলায়হিস সালাম এর নিকট এলাম। তিনি এবারও অনুরূপ বললেন, আর আমি পুনরায় আল্লাহর নিকট গেলাম আর আবেদন করলাম; তিনি আবারো দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। তারপর মূসা আলায়হিস সালাম-এর কাছে ফিরে এলে তিনি আবারো অনুরূপ বললেন। আমি আবার আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম। পরিশেষে আমাকে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ দিলেন। আমি মূসা আলায়হিস সালাম এর কাছে ফিরে এলাম। তিনি আমার উপর আদিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, আমার উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়তে সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করেছি। তাই আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের দরবারে গিয়ে আপনার উম্মতের জন্য (নামায) আরো হ্রাসের আবেদন করুন। নবী করীম এরশাদ করেন, আমি আমার মহান রবের কাছে কয়েকবার (নামায হ্রাস করার) আবেদন করেছি। আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। অতএব এখন আমি এতটুকুতেই সন্তুষ্ট এবং আমার প্রতিপালকের আদেশে আনুগত্য প্রকাশ করছি। নবী করীম এরশাদ করেন, আমি মূসা আলায়হিস সালামকে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম। তখন জনৈক আহ্বানকারী আওয়াজ দিয়ে বললেন, আমার আদেশ আমি জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য তা লঘু করে দিলাম।

-[বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, ৫৪৮ পৃষ্ঠা

মি'রাজ রজনীতে নবীজীর স্বচক্ষে আল্লাহ্'র দীদার লাভ

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِىْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلَّى اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অনুবাদ

হযরত জাবের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছেন- যখন কোরাইশরা মি'রাজের ঘটনার ব্যাপারে আমাকে অস্বীকার করতে চাইল তখন আমি মকামে হিজরে দাঁড়ালাম আর আল্লাহ্ পাক বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে আমার সামনে উপস্থাপন করলেন। আর আমি সেই বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে দেখে দেখে তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম। -[বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও মিশকাত শরীফ]

হাদীসের ব্যাখ্যা

মি'রাজ রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অন্যতম প্রধান মু'জিযা। এ মু'জিযা সংঘটিত হয়েছিল নবী-ই আকরামের নুবূয়ত প্রকাশের ১১ বছর ৫ মাস ১৫ দিনের মাথায়।

নুবূয়তের একাদশ বর্ষের পবিত্র রজব মাসের ২৭ তারিখ রাতের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সৌরজগত, সিদরাতুল মুন্তাহা, আরশ্-কুরসী ভ্রমণ করে লা-মকানে খোদার সাথে দীদার লাভ করে নব্বই হাজার কথাবার্তা শেষে পুনরায় মক্কা শরীফে ফিরে এসে দেখলেন বিছানাও গরম রয়েছে আর ঘরের দরজার শিকলও নড়ছে। পরের দিন নবী করীম যখন এ বিষ্ময়কর মি'রাজের ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন ক্বোরাইশ বংশের কাফিররা কোনমতেই তা বিশ্বাস করতে রাহি জলো না; বরং সরাসরি তারা মি'রাজের সত্যতাকে প্রত্যাখ্যান করল।

পক্ষান্তরে আবূ জাহল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, ''দেখো তোমাদের নবীর কাণ্ড। গত রাতেই নাকি তিনি সপ্ত আকাশ অতিক্রম করে আরশ্-কুরসী পরিভ্রমণ করে আবার রাত শেষ হবার আগেই পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। আসলে এটা কী করে সম্ভব?'' জবাবে সিদ্দীক্বে আকবর বললেন, ''এবার সিদ্দীক্বে আকবর বললেন, নবীজী যদি এ কথা বলে থাকেন, তাহলে আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস করলাম মি'রাজুন্নবী সত্য।''

মি'রাজের বর্ণনা পবিত্র ক্বোরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতেই এসেছে-

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَی الَّذِیْ بٰرَکْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ط اِنَّہٗ ھُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ O

''পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি আপন (মাহবূব) বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত, যার আশেপাশে আমি বরকত রেখেছি, যাতে আমি তাঁকে আপন মহান নিদর্শনসমূহ দেখাই, নিশ্চয় তিনি শুনেন, দেখেন।''

মি'রাজকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. মক্কা শরীফ হতে বায়্তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত। এ অংশকে বলা হয় 'ইসরা'।

২. বায়্তুল মুক্বাদ্দাস হতে সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত অংশকে বলা হয় 'মি'রাজ'।

৩. সিদরাতুল মুন্তাহা হতে লা-মকান পর্যন্ত। এ অংশকে বলা হয় 'ই'রাজ'। আর সাধারণভাবে পূর্ণ ভ্রমণকে মি'রাজুন্নবী বলা হয়।

অল্প সময়ে এ বিশাল জগত পরিভ্রমণ করে ফিরে আসা সত্যিই বিস্ময়কর। আল্লাহ্'র কুদরত এবং নবী-ই আকরাম মু'জিযার তথা অলৌকিক ক্ষমতার সামনে এটা একেবারেই স্বাভাবিক। সাধারণ লোকের জন্য আশ্চর্যজনক মনে হবে বলেই আল্লাহ্ পাক কালামে মজীদে 'সুবহানা' শব্দ দিয়ে মি'রাজের বর্ণনা দিয়েছেন। ঈমানদার মাত্র এই কুদরতী শক্তিকে মেনে নেয়। নবী করীমের মি'রাজ স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছিল, না সশরীরে হয়েছিল? এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা-বিশ্বাস ও ফত্ওয়া হল- নবী-ই পাকের মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল সশরীরে। কেবল স্বপ্নের মাধ্যমে মি'রাজ হলে এতে আশ্চর্যের কিছু থাকত না। আর কাফির-বেদ্বীনরাও এর বিরোধিতা করত না। কারণ, স্বপ্নের মাধ্যমে সাধারণতঃ অনেক কিছু দেখা যায়। সুতরাং মি'রাজ স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছে বললে নবী-ই পাকের এ মু'জিযার প্রকাশ হতো না।

'আশি'আতুল লুম'আত' কিতাবের ৪র্থ খন্ড ৫২৭ পৃষ্ঠায় শায়খই মুহাক্কিক হযরত আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়্হি লিখেছেন-''মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত ইসরা এবং মসজিদে আক্বসা হতে আসমান পর্যন্ত মি'রাজ। পবিত্র ক্বোরআনের দলিল দ্বারা প্রমাণিত ইসরা কেউ অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে আর হাদীসে মাশহূর দ্বারা প্রমাণিত মি'রাজ অস্বীকার করলে গোমরাহ্ হবে।''

শরহে আক্বাইদে নাসাফী'র ১০০ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

اَلْمِعْرَاجُ لِرَسُوْلِ اللّٰہِ ﷺ فِی الْیَقْظَۃِ بِشَخْصِہٖ اِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ اِلٰی مَاشَآءَ اللّٰہُ تَعَالٰی مِنَ الْعُلٰی حَقٌّ اَیْ ثَابِتٌ بِالْخَبَرِ الْمَشْھُوْرِ حَتّٰی اَنَّ مُنْکِرَہٗ یَکُوْنُ مُبْتَدِعًا۔

অর্থাৎ: রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়্হি ওয়াসাল্লাম'র মি'রাজ স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আসমানে পরিভ্রমণ অতঃপর সেখান থেকে আল্লাহ্'র ইচ্ছায় ঊর্ধ্বলোকে গমন ও পরিভ্রমণ করা মাশহূর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এটার অস্বীকারকারী বিদ'আতী হিসেবে গণ্য হবে।

শায়খ আহমদ মোল্লা জীবন রহমাতুল্লাহি আলায়্হি লিখেন-

اِنَّ الْمِعْرَاجِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی قَطْعِیٌّ ثَابِتٌ بِالْکِتَابِ وَاِلٰی سَمَآءِ الدُّنْیَا ثَابِتٌ بِالْخَبَرِ الْمَشْھُوْرِ وَاِلٰی مَافَوْقَہٗ مِنَ السَّمٰوٰتِ ثَابِتٌ بِالْاٰحَادِ فَمُنْکِرُ الْاَوَّلِ کَافِرٌ اَلْبَتَّۃَ وَمُنْکِرُ الثَّانِیْ مُبْتَدِعٌ مُضِلٌّ وَمُنْکِرُ الثَّالِثِ فَاسِقٌ۔

অর্থাৎ: মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত মি'রাজ 'পবিত্র কিতাবুল্লাহ্' দ্বারা প্রমাণিত, আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ 'হাদীসে মশহূর' দ্বারা প্রমাণিত আর তারও উপরে পরিভ্রমণ 'খবরে আহাদ' দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং প্রথমটাকে অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফির, দ্বিতীয়টির অস্বীকারকারী বিদ'আতী আর তৃতীয়টির অস্বীকারকারী ফাসিক্ব। [তাফসীরাতে আহমদিয়া, ৩২৮পৃষ্ঠা]

মোল্লা আহমদ জীবন রহমাতুল্লাহি আলায়্হি তাফসীরে আহমদিয়া'র ৩৩০ পৃষ্ঠায় আরো লিখেন-

اَلْاَصَحُّ اَنَّہٗ کَانَ فِی الْیَقْظَۃِ وَکَانَ بِجَسَدِہٖ مَعَ رُوْحِہٖ وَعَلَیْہِ اَھْلُ السُّنَّۃَ وَالْجَمَاعَۃِ فَمَنْ قَالَ اِنَّہٗ بِالرُّوْحِ فَقَطْ اَوْفِی النَّوْمِ فَقَطْ فَمُبْتَدِعٌ ضَالَ مُضِلٌّ فَاسِقٌ۔

অর্থাৎ- বিশুদ্ধতম মত হল মি'রাজ রূহ বিশিষ্ট শরীর সহকারে সম্পন্ন হয়েছিল এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা এটিই। যারা মি'রাজকে কেবল রূহানী (আত্মিক) কিংবা স্বপ্নিল বলে আক্বীদা পোষণ করে তারা বিদ'আতী, পথভ্রষ্ট এবং ফাসিক্ব।

নবীজীর সশরীর মি'রাজ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের এ যুগে আরো বেশি প্রমাণিত। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। সূর্য পৃথিবী হতে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। তাই সূর্য হতে আলো পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে প্রায় আট মিনিট। পবিত্র হাদীস শরীফের আলোকে প্রমাণিত চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র সবগুলো আমাদের প্রিয়নবীর নূর থেকে সৃষ্ট তথা নূরে মুহাম্মদীর একেকটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম শাখা। ক্ষুদ্রতম শাখার গতি যদি এত বেশি হয়, তাহলে মূল নূরের গতি কত হতে পারে তা সহজে অনুমেয়। তাই এক মুহূর্তে হাজার হাজার আলোকবর্ষ মাইল অতিক্রম করা নবী করীমের নূরানী সত্ত্বার জন্য একেবারেই সহজ। নবী-ই আকরাম স্বশরীরেই বিশাল নভোঃমন্ডল পার হয়ে লা-মকানে মহান আল্লাহ'র সাথে দীদার (সাক্ষাৎ) করেছেন এবং নব্বই হাজার কালাম করেছেন। যেমন- মিশকাত শরীফ ৬৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে হযরত আবদুর রাহমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ رَبِّىْ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَوَضَعَ كَفَيهِ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدْتُّ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَعَلِمْتُ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ـ

অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি আমার প্রতি পালককে অতি সুন্দর আকৃতিতে দেখেছি অতঃপর তিনি আমার দু'কাঁধের মধ্যখানে তাঁর কুদরতী হস্ত মুবারক রাখলেন। এতে আমি আমার বুকে শীতলতা অনুভব করলাম এবং আসমান-যমীনের মধ্যে যত কিছু রয়েছে সবকিছুই জেনে নিলাম।

এ হাদীস শরীফ থেকে দু'টি বিষয় পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে। প্রথমতঃ মি'রাজের রজনীতে নবী করীম মহান আল্লাহ্ পাকের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। আর ওলামা-ই কিরাম এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মি'রাজের রজনীতে নবীজী জাহেরী চক্ষু দ্বারাই মহান রব্বুল আলামীনের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

মি'রাজ হতে ফিরে নবী করীম দেখতে পেলেন বিছানা এখনো গরম রয়েছে। ভোরে তিনি কাবাগৃহে তাশরীফ নিয়ে সকলের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। আবু জাহ্ল গং তথা ক্বোরাইশ দলপতিরা এ কথা শুনে পরীক্ষার ছলে বায়্তুল মুক্বাদ্দাসের দরজা, জানালা ইত্যাদির বিবরণ জানতে চাইল। তারা এ কথাও জানত যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইতিপূর্বে কোনদিন বায়্তুল মুক্বাদ্দাসে যান্নি। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন সাথে সাথে জিব্রাঈল আমীনের মারফতে বায়্তুল মুক্বাদ্দাসের পূর্ণ চিত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার সামনে তুলে ধরলেন আর তিনি দেখে দেখে দরজা, জানালা

ইত্যাদির বর্ণনা বিস্তারিতভাবে দিয়ে দিলেন। এতেও হতভাগা কাফিররা নবীকরীমের মি'রাজকে বিশ্বাস করল না। পক্ষান্তরে হযরত আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু কোন প্রকার দলিল-প্রমাণ তালাশ ব্যতীত নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে নিলেন এবং নিরেট সত্য বলে ঘোষণা দিলেন। নবী করীম আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন- হে আবূ বকর মি'রাজের ঘটনা এভাবে বিশ্বাস করলে কেন? উত্তরে আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এয়া রসূলাল্লাহ্ ! এটাতো সহজ বিষয়। এর চাইতেও অনেক বড় বিষয় না দেখে আপনার কথায় বিশ্বাস করেছি। যেমন মহান আল্লাহ্কেও তো স্বচক্ষে দেখিনি। আপনার কথার উপর বিশ্বাস করেই মহান আল্লাহ্'র উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনার কথায় বিশ্বাস রেখেই মি'রাজের সত্যতার উপর নিরঙ্কুশ সমর্থন দিলাম। উত্তর শুনে নবীজী খুশী হলেন, আর তাঁকে 'সিদ্দীক্ব-ই আকবর' উপাধীতে ভূষিত করলেন।

--><--

চলো মুসাফির মদীনার পানে

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَآءَنِىْ زَآئِرًا لَاتَحْمِلُهٗ حَاجَةٌ اِلَّا زِيَارَتِىْ كَانَ حَقًّا عَلٰى اَنْ اَكُوْنَ لَهٗ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَة .

অনুবাদ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার যিয়ারতের উদ্দেশে আসে এবং তার সফরে আমার যিয়ারত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকেনা, ক্বিয়ামত দিবসে তার জন্য শাফা'আতকারী হওয়া আমার হক্ব (দায়িত্ব) হয়ে যায়। [দারে ক্বুতনী, তাবরানী, মাজমা'উয্ যাওয়াইদ, মীযানুল ই'তিদাল]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ হাদীস শরীফে বিশেষত দু'টি বিষয় পরিলক্ষিত। প্রথমত যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা, আর দ্বিতীয়ত শাফা'আতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা আশিক্বে রসূলের জন্য অতৃপ্ত বাসনা, একজন ঈমানদারের জন্য বিশাল নি'মাত, প্রাণাধিক প্রিয় রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে সরাসরি হাযির হয়ে নিজের মনের গভীরে লালিত দীর্ঘদিনের কথাবার্তা-আলাপ-আকুতি পেশ করার সুবর্ণ সুযোগ তো এটাই। উম্মতের কাণ্ডারী উভয়জগতের মুক্তির দিশারীও অপেক্ষায় থাকেন দুঃখী উম্মতের আকুতি-মিনতি শুনে তাদেরকে মুক্তির ঠিকানায় পৌঁছাতে। জীবদ্দশায় সাহাবা-ই কেরাম বিপদ-মুসিবতে নবী করীমের দরবারে গিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান নিয়ে যেতেন। তদ্রূপ ইহজগত থেকে আড়াল হওয়ার পরও সমানভাবে বিপদগ্রস্ত উম্মতের সাহায্যে নবী করীমের রয়েছে সক্রিয় ক্ষমতা ও ভূমিকা। এ নিয়ে হাজারো দৃষ্টান্ত রয়েছে।

পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে যিয়ারতে মদীনার রয়েছে অশেষ ফযীলত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ঈমানদার মুসলমানের প্রাণপ্রিয় সেই মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারতকে কতিপয় জ্ঞানপাপী নাজায়েয, শির্ক ইত্যাদি ফতোয়াবাজি করে সরলমনা মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এরা সহীহ বুখারী শরীফের একটি হাদীসের ভুলব্যাখ্যা করে মানুষকে বঞ্চিত করতে চায়। তারা যে হাদীস দ্বারা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে যেতে নিষেধ করে সেই হাদীসেই মূলত মদীনা শরীফ যাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। আমরা প্রথমে তাদের সেই

দলীল দিয়েই যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারার ফযীলতের বর্ণনা শুরু করব।

হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ. اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى.

অনুবাদ: তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের দিকে অধিক সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না: মসজিদে হারাম (কা'বা শরীফ), মসজিদে রসূল (মদীনা শরীফের মসজিদে নবভী শরীফ) ও মসজিদে আক্বসা (বায়তুল মুক্বাদ্দাস)।

-(বুখারী শরীফ : কিতাবুল জুমু'আহ, মুসলিম শরীফ : কিতাবুল হজ্জ, নাসাঈ শরীফ : কিতাবুল মাসাজিদ)

আমরা জানি, মসজিদে হারাম তথা কা'বা ঘরের মর্যাদা বেশি হওয়ার কারণ হলো, সেটি মহান আল্লাহ্র ঘর এবং মুসলিম মিল্লাতের ক্বেবলা আর মসজিদে আক্বসার ফযীলত এই কারণে যে, ওটা এক সময় মুসলমানদের ক্বিবলা ছিলো। কিন্তু মসজিদে নবভীর এত ফযীলত কেন? সেটাতো কোনকালে কোন মুসলমানের ক্বেবলা ছিলনা। এর উত্তর একটাই- এই মসজিদের সাথে সম্পর্ক রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে। নবীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে যদি মসজিদে নবভীর মূল্য এত বেড়ে যায়, যেখানে অধিক সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করার কথা হাদীস শরীফে এসেছে, সেই নূর নবীর পবিত্র নূরানী দেহ মুবারক যে রওযা পাকের সাথে লেগে আছে, সেই রওযা মুবারকের মূল্য কত বেশি, তা বিবেক থাকলে বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। অধিকন্তু রওজা পাকের ফযীলতের পক্ষে অনেক দলীলতো রয়েছেই।

দ্বিতীয়ত উল্লিখিত হাদীস শরীফ দ্বারা যিয়ারতের উদ্দেশে মদীনা শরীফ যাওয়া নিষিদ্ধ ফতোয়া দেয়া মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ হাদীসের বিষয়বস্তুই হলো নামায; যিয়ারতের প্রসঙ্গ সেখানে নেই। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে ওই হাদীসের শিরোনামই হল- 'বাবু ফাদ্বলিস্ সালাতি ফী মাসজিদি মাক্কা ওয়াল মাদীনা? (মক্কা ও মদীনা শরীফের মসজিদে নামাযের ফযীলত)। সুতরাং নামায আর যিয়ারত এক বিষয় নয়। তাই নামাযের ফযীলতের হাদীস দ্বারা যিয়ারতকে নিষিদ্ধ করার কী যুক্তি থাকতে পারে? আর শুধু নামাযের ফযীলতের উদ্দেশ্যে হাজ্বী সাহেবরা যদি মক্কা শরীফ হতে মদীনা শরীফ যায়, তাহলে নিশ্চয় তাদেরকে বোকা বলতে হবে। কারণ মসজিদে নবভীর চাইতে অনেক বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় মসজিদে

হারাম শরীফে। অতএব অধিক সাওয়াবের স্থান রেখে অন্য স্থানে তারা যাবে কোন দুঃখে। তাই নিঃসন্দেহে বলতে হবে বেশি সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররামা হতে কেউ মদীনা মুনাওয়ারা সফর করেনা, বরং হাবীবে কিবরিয়া মাহবূবে খোদার সান্নিধ্যে তাঁর খাস দয়া-করুণা ও মেহেরবানী লাভের উদ্দেশ্যেই সকলে মদীনা শরীফ সফর করে থাকেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাফসীরে ইবনে কাসীরে উদ্ধৃত করেন- উত্বা নামক জনৈক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন, আমি একদা নবী-ই আকরামের রওযা পাকের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় একজন লোক এসে বললেন- আস্সালামু আলায়কা ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি শুনেছি আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন-

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

অর্থাৎ: আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুল্ম করে (অপরাধ বা গুনাহ্ দ্বারা আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে) তখন (হে মাহবূব! তারা) আপনার দরবারে হাযির হয়, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই (তারা) আল্লাহ্কে অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু হিসেবে পাবে। -সূরা নিসা : আয়াত-৬৪

এই আয়াত তিলাওয়াত করে ওই আগন্তুক নবী-ই আকরামকে সম্বোধন করে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে শাফা'আতকারী মেনে আমার গুনাহ্ প্রার্থনাকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাযির হয়েছি। অতঃপর আরবি ভাষায় একটি কবিতা আবৃত্তি করে চলে গেলেন।

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন- এক পর্যায়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম আর স্বপ্নে দেখলাম নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন, হে উত্বা! তুমি ওই লোকটাকে ডেকে দিয়ে সুসংবাদ দিয়ে দাও, মহান আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন।

-[সূত্র: বায়হাক্বী : শু'আবুল ঈমান : ৩য় খন্ড ৪৯৫ পৃষ্ঠা, ইবনে কুদামা : আল্ মুগনী : ৩য় খন্ড ২৯৮ পৃষ্ঠা, ইমাম নববী : কিতাবুল আযকার : ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা, ইমাম সুবকী : শিফাউস্ সিক্বাম : ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা]

হযরত কা'বুল আহবার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে সম্বোধন করে বললেন,

هَلْ لَكَ اَنْ تَسِيْرَ مَعِىْ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَنَزُوْرَ قَبْرَ النَّبِىِّ ﷺ وَنَتَمَتَّعَ

بِزِيَارَتِهٖ، فَقُلْتُ نَعَمْ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْن.

অর্থাৎ আপনি কি আমার সাথে নবী-ই আকরামের রওযা মুবারক যিয়ারতের জন্য যাবেন? এবং যিয়ারতের মাধ্যমে ফয়য- বরকত হাসিল করবেন? তিনি জবাব দিলেন, জ্বী হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন!

অতঃপর তারা উভয়েই মদীনা মুনায়ারায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং প্রথমে হুযূর আকরাম-ই সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে সালাম পেশ করলেন, অতঃপর হযরত আবূ বক্র সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কবর শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সালাম পেশ করলেন। পরিশেষে দু'রাক্'আত নামায আদায় করলেন। -[সূত্র: ফাতহুশ্ শাম : ১ম খন্ড ২৪৪ পৃষ্ঠা কৃত ইমাম ওয়াক্বেদী]

মদীনায়ে তৈয়্যবা কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে, এমনটি নয়; বরং স্বয়ং নবীজী মদীনা শরীফকে অধিক পরিমাণে ভালবাসতেন, আর মহান আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করতেন-

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ

(হে আল্লাহ্! আমাদের অন্তরে মদীনা শরীফের ভালবাসা দান করুন যেমন আমরা ভালবাসি মক্কা শরীফকে অথবা এর চাইতেও বেশি)। নবী করীম আরো এরশাদ করেন-

مَنْ مَّاتَ بِالْمَدِيْنَةِ كُنْتُ لَهٗ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَة

(যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করে, আমি ক্বিয়ামতের দিন তার সুপারিশকারী হব)। ওলামা-ই কেরামের অভিমত হচ্ছে রসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমে মদীনাবাসীদের জন্য এরপরে মক্কাবাসীদের জন্য এরপর তায়েফবাসীদের জন্য সুপারিশ করবেন। [জাযবুল কুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবূব]

অপর বর্ণনায় রয়েছে-

مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ فَمَنْ مَّاتَ بِالْمَدِيْنَةِ كُنْتُ لَهٗ شَفِيْعًا وَشَهِيْدًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করতে পারে সে যেন মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করে। কারণ যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেব এবং সুপারিশকারী হব।

ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'মুআত্তা-ই মালিক'-এ একটি বর্ণনা এনেছেন- হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে

আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি মক্কাকে মদীনা হতে উত্তম মনে কর? তিনি উত্তরে বললেন, ''মক্কা শরীফ আল্লাহ্‌র হেরম এবং নিরাপত্তার স্থান এবং সেখানে আল্লাহর ঘর অবস্থিত।'' হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন- আমি আল্লাহ্‌র হেরেম এবং আল্লাহর ঘর সম্পর্কে কিছু বলতে চাইনা। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি মক্কাকে মদীনার চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে কর? তিনি পুনর্বার জবাবে বললেন, ''মক্কা শরীফে আল্লাহ্‌র হেরেম এবং তাঁর ঘর বিদ্যমান।'' হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমি মহান আল্লাহর হেরেম এবং তার ঘর সম্পর্কে কিছু বলছিনা। এভাবে কয়েকবার বলে তিনি চলে গেলেন। হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই কথোপকথন থেকে বুঝা গেল- পবিত্র কা'বাঘর ও হেরেম শরীফ বাদ দিলে সমগ্র মক্কা নগরী থেকে মদীনা শরীফই শ্রেষ্ঠ।

মদীনা মুনাওয়ারার এই ব্যাপক মর্যাদার মূল কারণ হল, সেখানে দু'জাহানের সরদার কামলীওয়ালা নবীপাকের পবিত্র রওযা শরীফ অবস্থিত, যে রওযা পাকের যিয়ারতকারীদের জন্য রয়েছে অনেক সুসংবাদ। নিম্নে রওজা শরীফ যিয়ারতের ফজীলত বিষয়ক কতিপয় হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করা হল-

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ অর্থ: ''যে আমার রওযা মুবারক যিয়ারত করে, তার জন্য সুপারিশ করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়।'' -[দারে কুতনী, নাওয়াদেরুল উসূল, বায়হাক্বী, মীযানুল ই'তিদাল]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ زَارَنِىْ بِالْمَدِيْنَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় হাজির হয়ে আমার যিয়ারত করবে, আমি ক্বিয়ামত দিবসে তার সাক্ষী হব এবং তার জন্য সুপারিশকারী হব।

[সূত্র: বায়হাক্বী, শিফাউস্ সিক্বাম, তালখীসুল হাবীব]

হযরত উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী-ইপাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন-

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ اَوْ قَالَ مَنْ زَارَنِىْ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيْدًا وَمَنْ مَّاتَ فِىْ اَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللّٰهُ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

অর্থাৎ যে আমার রওযা পাক যিয়ারত করে অথবা বললেন আমার যিয়ারত করে,

আমি তার জন্য সাক্ষী ও সুপারিশকারী হব এবং যে হারামাঈনে শরীফাঈনের যে কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামত দিবসে নিরাপদে উঠাবেন। [সূত্র: মুসনাদে ত্বায়ালেস, দারে কুতনী, বায়হাক্বী]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ وَفَاتِىْ فَكَاَنَّمَا زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ

অর্থাৎ যে হজ্ব করল আর আমার ওফাতের পর আমার রওযা পাক যিয়ারত করল, সে যেন জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল। [দারে কুতনী, তাবরানী, মিশকাতুল মাসাবীহ]

নবীজী এরশাদ করেন-

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ

অর্থাৎ ''যে বায়তুল্লাহ্'র হজ্ব করল কিন্তু আমার যিয়ারত করলনা, সে আমাকে কষ্ট দিল।''

মদীনা শরীফ এবং রওযা পাক যিয়ারতের অশেষ ফযীলতের কতিপয় হাদীসে যিয়ারত না করার কঠিন পরিণতির বর্ণনাও হাদীস শরীফে দেখলাম। সুতরাং এখানেই প্রমাণিত হয়ে যায়, কে নবীজীর আশিক্ব-প্রেমিক, আর কার অন্তরে নবীবিদ্বেষ। যুগে যুগে হক্ব-বাতিলের সংঘাত ছিল, এখনও রয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, বিবেককে কাজে লাগিয়ে নিজের জীবন পরিচালনা করা। ইবলিস শয়তান এবং তার প্রেতাত্মারা যতই বিভ্রান্ত করতে চাইবে সত্যিকার ঈমানদার ততবেশি সতর্ক হবে। তেমনি বর্তমান বিশ্বের বাতিলপন্থীরা মদীনা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়াকে যতই বিদ্'আত-শির্ক বলুকনা কেন, প্রেমিকদের জোয়ার ঠেকানো কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। আ'লা হযরতের ভাষায় শুনুন প্রেমিকমনের অভিব্যক্তি-

جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے
تم نہیں چلتے رضاؔ سارا تو سامان گیا

জা-ন ও দিল হো-শ ও খিরদ সব তো- মাদী-নে পৌঁহছে-
তোম নেহীঁ চলতে- রেযা- সা-রা- তো সা-মা-ন্ গেয়া-।

--><--

কেবল পানাহার বর্জনে রোযার সার্থকতা নেই

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ –

رَوَاهُ الْبُخَارِىْ مِشْكٰوة: صفحه ١٧٦

অনুবাদ

হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি (রোযা রেখে) মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আচরণ পরিহার করেনা তার খাবার বর্জন (উপবাস) আল্লাহ্র কোনই প্রয়োজন নেই। [বুখারী শরীফ; মিশকাত: ১৭৬ পৃষ্ঠা]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস মাহে রমযান। পাহাড়সম পাপ থেকে পরিত্রাণের মাস মাহে রমযান। সর্বোপরি আত্মশুদ্ধির মাস মাহে রমযান। দীর্ঘ একমাস রোযা রেখে নিজের নাফসকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে অন্তরে তাক্বওয়া বা পরহেযগারী অর্জন করাই হচ্ছে রমযানের উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র ক্বোরআনেও ইঙ্গিত দিয়েছেন, ''হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য; যেন তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার।'' [সূরা বাকারা-১৮৩ আয়াত]

রোযা রাখার নিয়ম সর্বযুগেই প্রচলিত ছিল। আদিপিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে শুরু করে আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নবী-রসূল সকলেই সিয়াম পালন করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ হিজরত করে দেখতে পেলেন- ইহুদীরা আশুরার রোযা পালন করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার তোমরা এ দিনে রোযা পালন কর কেন? উত্তরে তারা বলল, এদিন উত্তম দিবস, এদিনে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে শত্রুর কবল হতে নাজাত দিয়েছিলেন। তাই মূসা আলায়হিস্ সালাম এ দিনে রোযা পালন করেছেন। এ কথা শুনে আল্লাহ্র রসূল বললেন, আমি তোমাদের চাইতেও মূসা আলায়হিস্ সালাম'র অধিক নিকটবর্তী।

উল্লিখিত ক্বোরআনের আয়াত এবং হাদীস শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হল পূর্ববর্তী

উম্মতগণের উপরও রোযা ফরজ ছিল। তবে সংখ্যা এবং কাঠামোর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তারা বিভিন্ন নি'মাত প্রাপ্তি কিংবা কোন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে রোযা পালন করতেন। কিন্তু আল্লাহ আমাদের উপর দীর্ঘ একমাস রোযা পালনের হুকুম দিয়েছেন আমাদের আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে, যেন আমরা মুত্তাক্বী বা পরহেযগার হতে পারি। আলোচ্য হাদীস শরীফে সেই তাক্বওয়া অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ, কেউ রোযা রাখার মানসে সারাদিন উপবাস থাকল, পাশাপাশি সারাটা দিন মিথ্যা, পাপাচার, পরনিন্দা, জুলুম ইত্যাদির মধ্যে ডুবে রইল। তাতে কোন সাওয়াব পাবে না। কেননা কেবল উপবাস থাকার নাম রোযা নয়।

বিভিন্ন ধর্মে উপবাস

পৃথিবীর সব ধর্মমতেই কোন না কোন রকমের উপবাস ব্রত পালনের নিয়ম রয়েছে। পুরাকালে কেল্ট রোমান আসীরীয় বেবিলনীয়দের মধ্যে রোযার প্রচলন ছিল। ইয়াহুদী-খ্রিস্টান, জয়থুস্ত্র, কুনফুসিয়াস, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মে উপবাসব্রত পালন করা হয়।

কিন্তু ইসলামের সিয়াম এ ধরনের কোন উপবাসের সাথে তুলনা হয়না; বরং ইসলামের দৃষ্টিতে রোযা অবস্থায় সুবহি সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছু খাওয়া ও পান করা কোন প্রকারের ইন্দ্রিয় পরিচর্যা নিষিদ্ধ। আর সূর্যাস্তের পর হতে সুবহি সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যেকোন ধরনের হালাল পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম বৈধ। কেবল বাহ্যিক আহার-বিহারে সংযম সাধনা করবে তা নয়, বরং মিথ্যা, পরনিন্দা, পরের অকল্যাণ চিন্তা করা, কারো প্রতি জুলুম, নির্যাতন করা অপরের সাথে প্রতারণা করা ইত্যাদি মন্দ কাজ শুধু নিষিদ্ধই নয়, বরং এসব করলে তার রোযা পালন কেবল উপবাসের নামান্তর। আর সেই ধরনের উপবাস থাকার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ ধরনের উপবাসের কোন মূল্য নেই মর্মে এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মিথ্যা, গীবত সম্পর্কে অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ''মিথ্যাবাদী ও গীবতকারী যেন হারাম বস্তু দিয়েই ইফতার করল।'' অন্য এক হাদীসে রয়েছে- اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ ''রোযা ঢাল''। অর্থাৎ রোযা যাবতীয় আযাব হতে রোযাদারকে ঢালের মত রক্ষা করে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ওই রোযা হবে নিরেট আল্লাহর ওয়াস্তে। কোন ধরনের কৃত্রিমতা কিংবা কলুষতাপূর্ণ থাকতে পারবে না। কারণ, রোযা অবস্থায় কেউ যদি মিথ্যা, চুরি, পরনিন্দা ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন রোযা আর স্বচ্ছ থাকে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি তা'আলা ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন- অনেক রোযাদার এমন রয়েছে,

যাদের অনাহারে কষ্ট ছাড়া কিছু লাভ হয়না, অনেক নামায প্রতিষ্ঠাকারী এমন রয়েছে যাদের নিশি জাগরণ কোন কাজে আসেনা।

রমযান মাগফিরাত তথা গুনাহ্ মার্জনার মাস। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি ঈমান ও একাগ্রতার সাথে রোযা পালন করে তার অতীতের গুনাহ্সমূহ মার্জনা করে দেয়া হয়। আল্লাহ্র হাবীব আরো এরশাদ করেন, রমযান মাস আগমন করলে বেহেশতের দরযাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানগুলোকে শিকলাবদ্ধ করা হয়। একদল ঘোষণাকারী বলে যে, হে কল্যাণপ্রার্থী এগিয়ে এসো, আর হে অন্যায় ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী তুমি নিবৃত হও।

উল্লিখিত ক্বোরআন-হাদীসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, যে উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ আমাদের উপর ত্রিশ রোযা ফরয করেছেন সে উদ্দেশ্য যাতে পরিপূর্ণভাবে হাসিল হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে রোযা অবস্থায় এবং রমযানের পরও সারাটি বৎসর মিথ্যা কথা, মিথ্যা আচরণ ইত্যাদি পরিহার করে জীবন পরিচালনা করে তাক্বওয়া অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

--><--

তারাবীর নামায আট রাক্'আত নয়, বিশ রাক্'আত

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِى غَيْرِ جَمَاعَةٍ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ

অর্থাৎ: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে (একাকী) বিশ রাক্'আত (তারাবীহ্) নামায আদায় করতেন, অতঃপর বিত্র পড়তেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তারাবীর নামায বিশ রাক্'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা। আলোচ্য হাদীসসহ অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তারাবীর নামায নবী-ই আকরাম বিশ রাক্'আত পড়েছেন এবং পরবর্তীতে সাহাবা-এ কেরামও বিশ রাক্'আত পড়তেন। তবে কোন কোন বর্ণনায় আট রাক্'আতের কথা উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে সাহাবা-এ কেরামের ইজমা' দ্বারা তারাবীর নামায বিশ রাক্'আত সুন্নাত হিসেবে নির্ধারিত হয়।

সুতরাং ইজমা'-এ সাহাবার পর বর্তমানে কারো উক্ত নামাযের রাক্'আতের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক করার কোন সুযোগ নেই। তারাবীর নামায বিশ রাক্'আত হানাফী মাযহাবের ফতোয়া। ইদানিং কোন কোন টিভি চ্যানেলে তারাবীর নামায আট রাক্'আতই বলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে; যা একদিকে সহীহ হাদীস বিরোধী অন্যদিকে হানাফী মাযহাব বিরোধী ষড়যন্ত্র। তাই সরলমনা মুসল্লীদেরকে বিভ্রান্তির কবল হতে মুক্ত করার জন্য এ আলোচনার প্রয়াস। নিম্নে বিশ রাক্'আত তারাবীর পক্ষে আরো কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করা হল:

হাদীস নম্বর-১

عَنْ سَائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانُوْا يُقِيْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَ عَلٰى عَهْدِ عُثْمَانَ وَ عَلِىٍ مِثْلَهُ.

অর্থাৎ: হযরত সা-ইব ইবনে ইয়াযীদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র যামানায় তারা সকলেই রমযান মাসে বিশ রাক্'আত করে তারাবীর নামায পড়তেন, হযরত উসমান ও হযরত আলী'র যামানায়ও তদ্রূপ ছিল। [আত্তা-ই ইমাম মালেক : ৪৫ পৃষ্ঠা]

হাদীস নম্বর-২

رَوٰى ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَالطَّبْرَانِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ.

অর্থাৎ: হযরত ইবনে আবূ শায়বা, ইমাম তাবরানী এবং ইমাম বায়হাক্বী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, ‘‘নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযানের রাতে বিত্র ব্যতীত বিশ রাক্‘আত (তারাবীহ) নামায আদায় করতেন। -[হাশিয়ায়ে বুখারী : ১৫৪ পৃষ্ঠা]

হাদীস নম্বর-৩

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِىْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَلاَثٍ وَّ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থাৎ:হযরত ইয়াযীদ ইবনে রূমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র সময় মানুষ বিত্রসহ তেইশ রাক্‘আত তারাবীহ নামায পড়তেন। -[মুআত্তা ইমাম মালিক-৪৫, বায়হাক্বী-সুনানে কুবরা ২য় খণ্ড ৪৯৫ পৃষ্ঠা]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত ‘আন্ওয়ারুল মুক্বাল্লিদীন’ নামক গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে, হযরত আবুল হাসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রমযানে মুসল্লীসহ বিশ রাক্‘আত তারাবীহ্ পড়ার জন্য হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হাদীস নম্বর-৪

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন, অধিকাংশ আলেমের মতে তারাবীর নামাযের রাক্‘আতের সংখ্যা বিশ, যা হযরত ওমর ও হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতেই বর্ণিত এবং এটি প্রবীণ তাবে‘ঈ হযরত সুফিয়ান সাওরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক এবং ইমাম শাফে‘ঈ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার অভিমত। এমনকি ইমাম শাফে‘ঈ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি মক্কা নগরীতে লোকদেরকে বিশ্ রাক‘আত করে তারাবীহ্ নামায পড়তে দেখেছি।

-[তিরমিযী শরীফ : কিতাবুস্ সওম]

হাদীস নম্বর-৫

عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِىْ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ دَعَا الْقُرَّاءَ فِىْ رَمَضَانَ فَاَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً قَالَ وَكَانَ عَلِىٌّ يُوْتِرُبِهِمْ.

অর্থাৎ: হযরত আবূ আবদুর রহমান সালামী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু রমযান মাসে ক্বারীদেরকে ডাকলেন এবং তন্মধ্যে একজনকে নির্দেশ দিলেন যেন লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাক্‘আত তারাবীহ পড়িয়ে দেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি নিজেই বিত্র পড়াতেন।

-[বায়হাক্বী : সুনানি কুবরা ২য় খণ্ড ৪৯৬ পৃষ্ঠা]

হাদীস নম্বর-৬

عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اِبْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يُصَلِّىْ بِنَا فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

অর্থাৎ: হযরত নাফে’ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, হযরত ইবনে আবূ মুলায়কা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু রমযান মাসে আমাদেরকে নিয়ে বিশ রাক্‘আত তারাবীহ্ নামায পড়তেন। -[মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২য় খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৬৮৩]

হাদীস নম্বর-৭

عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَىِّ ابْنِ كَعْبٍ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ فَكَانَ يُصَلِّىْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

অর্থাৎ: হযরত হাসান বসরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত উবাই ইবনে কা’ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র নেতৃত্বে লোকদেরকে একত্রিত করতেন এবং তিনি তাঁদেরকে নিয়ে বিশ রাক্‘আত তারাবীহ্ নামায পড়তেন। -[তালখীসুল খবীর : ইবনে হাজর আসক্বালানী]

তাছাড়া তিরমিযী শরীফের ‘সওম’ অধ্যায়ে ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

اِخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ فَرَاٰى بَعْضُهُمْ اَنْ يُّصَلِّىَ اِحْدٰى وَاَرْبَعِيْنَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ وَهُوَ قَوْلُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلٰى اَهْلِ الْعِلْمِ عَلٰى مَا رُوِىَ عَنْ عُمَرَ وَ عَلِىٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكَ وَالشَّافِعِىِّ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ وَهٰكَذَا اَدْرَكْتُ بِبَلْدَنَا بِمَكَّةُ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

অর্থাৎ: রমযানের ক্বিয়াম (তারাবীহ) সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে, কোন কোন আলিম বলেন বিতিরসহ এর রাক্‘আত সংখ্যা একচল্লিশ। তা হল মদীনাবাসীদের অভিমত এবং তাদের মধ্যে এর প্রচলন রয়েছে। আর অধিকাংশ আলেমের অভিমত হল, হযরত ওমর ও আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখ সাহাবী হতে কৃত বর্ণনানুযায়ী তারাবীহ নামাযের রাক্‘আত সংখ্যা হল বিশ রাক্‘আত। সুফিয়ান সওরী, ইবনে মুবারক এবং ইমাম শাফে‘ঈর অভিমতও এটাই। ইমাম শাফে‘ঈ বলেন, আমি আমাদের মক্কা নগরীতেও এ ধরনের আমল লক্ষ্য করেছি, তারা বিশ রাক্‘আত তারাবীহ্ নামায আদায় করেন।

উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী ৫ম খণ্ডে রয়েছে-

قَالَ الْعَلَّامَةُ اِبْنُ الْحَجَرِ الْمَكِّيُّ اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلٰى اَنَّ التَّرَاوِيْحَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থাৎ: হযরত আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, সাহাবীগণ এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, তারাবীহ্ নামায বিশ রাক্‘আত।

উল্লিখিত আলোচনা পবিত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল- তারাবীহ্ নামায বিশ রাক্‘আত এবং ইমাম আ’যম আবূ হানীফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর অনুসারী ফক্বীহগণের গৃহীত মতানুযায়ী তারাবীহ্র নামায বিশ রাক্‘আত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। তবে নবী করীমের যামানায় তারাবীহ নামায জামা‘আত সহকারে ধারাবাহিকভাবে আদায় হত না। নবী-ই আকরাম মাঝে-মধ্যে জামা‘আতে পড়তেন আবার কখনো ছেড়েও দিতেন। কারণ তিনি লাগাতার নিয়মিত আদায় করলে তা আমাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যেত। তাই মাঝেমধ্যে ছেড়ে দিতেন। কিন্তু হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র যামানায় এসে তা জামা‘আত সহকারে আদায় করার নিয়ম প্রচলিত হয়ে গেল এবং এতে আনন্দিত হয়ে হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ (এটা কতই উত্তম বিদ্‘আত!) পরবর্তীতে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিশ রাক্‘আত তারাবীর নামায জামা‘আত সহকারে আদায় করতেন মর্মে সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং এটাই আমাদের জন্য দলীল, অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। যেমন নবী-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهدين

অর্থাৎ: ‘‘তোমাদের উচিত আমার সুন্নাত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফা-ই রাশিদীনের সুন্নাতের উপর আমল করা।’’

বিশ রাক্‘আত তারাবীহ প্রথম নবীজীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, দ্বিতীয়ত খোলাফা-ই রাশিদীনের সুন্নাত, তৃতীয়ত ইজমা‘-ই উম্মাত দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, যুগ যুগ ধরে প্রচলিত বিশ্ রাক্‘আত তারাবীহ্ নামাযই সঠিক। এর বিপরীত কোন ফতোয়া-বক্তব্য ঈমানদার মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আর যারা তারাবীহ নামায বিশ রাক্‘আতের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি করে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করতে চায়। আর এরাই ইসলামের দুশমন। আল্লাহ্ আমাদেরকে হানাফী মাযহাবের উপর আমল করার তাওফীক্ব দান করুন। আ-মীন ।।

--><--

শাওয়ালের ৬ রোযা : সারা বছর রোযা রাখার সাওয়াব

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ سِتَّةَ اَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ـ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَة

অনুবাদ

হযরত সাওবান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিত্‌রের পর (শাওয়াল মাসে) ছয়টি রোযা পালন করে, তার জন্য সারা বৎসরের রোযা হয়ে যাবে। যে একটি ইবাদত করে তার জন্য দশগুণ সাওয়াব রয়েছে।

[ইবনে মাজাহ্, ১ম খণ্ড, ১২৪পৃষ্ঠা। আত্-তারগীব ওয়াত্ তারহীব, ২য় খণ্ড, ১১০পৃষ্ঠা। কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, ৫৬৯পৃষ্ঠা। আদদুররুল মনসূর, ৩য় খণ্ড, ৬৬পৃষ্ঠা]

বর্ণনাকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম সাওবান, উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্। প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন আর ক্রীতদাস থাকাবস্থায়ই রসূল-ই করীমের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম তাঁকে দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত করে দেন। ইসলাম গ্রহণের পর হতে নবীজির সান্নিধ্যে সারাক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারাকে তিনি জীবনের সার্থকতা মনে করতেন। হাদীস শরীফ বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন বলে সার্বক্ষণিকভাবে নবী করীমের সাহচর্য পাওয়ার পরও তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৭টি। নবীপ্রেমে নিবেদিত এই সাহাবী ৫৪ হিজরিতে আমীরে মু'আভিয়ার শাসনামলে হামাস্ নামক এলাকায় ইন্তিকাল করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'শাওয়াল' চান্দ্রমাসের দশম মাস। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের ফযীলতে সমৃদ্ধ মাহে রমযানের বিদায়লগ্নে এ মাসের শুরুতেই পাপাচারের আশঙ্কা থাকে প্রবল। কারণ, সারা রমযান মাস সংযমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা মুমিনকে সদ্যমুক্ত শয়তান দ্বিগুণ উত্তেজিত হয়ে মানুষকে কুপথে পরিচালিত করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তাই এ মাসে হঠাৎ করে সমাজে বিশেষ করে তরুণ সমাজে পাপের মাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এ মাসে নিজের নাফ্সকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখা কঠিন। আর সেই কঠিন কাজটি করতে পারলেই সফলতা হাতের নাগালে। যেমন পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে, ''ক্বাদ আফলাহা মান্ তাযাক্কা-'' (সে সফল হয়েছে, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে)। আর শাওয়ালের যাবতীয় আনন্দ ও পুরস্কার তার জন্য অবধারিত।

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর বান্দা যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে তা ধরে রাখাও বড় দায়িত্ব। তাই ইবলীস শয়তান যাতে কোন দিকে বিভ্রান্ত করতে না পারে সে জন্যে এ মাসে বিশেষ কিছু নফল ইবাদতের উল্লেখ হাদীস শরীফে পাওয়া যায়।

শাওয়ালের ছয়রোযা

এ মাসের নফল ইবাদতসমূহের মধ্যে অন্যতম ইবাদত হল ছয় রোযা। এ নফল রোযাসমূহের অশেষ ফযীলত সম্বন্ধে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র মুখনিসৃত কয়েকটি হাদীস শরীফ পাওয়া যায়। আলোচ্য হাদীস তন্মধ্যে অন্যতম। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে, অতঃপর (রমযানের রোযার) অনুসরণে শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে, তার জন্য সর্বদা রোযা রাখার মত সাওয়াব হবে।'' [মুসলিম ১:৩৬৯, মিশকাত, ১৭৯পৃ.]

উল্লেখ্য, ইমাম শাফে'ঈ রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মতে এই ছয়টি রোযা পর পর (একনাগাড়ে) রাখা উত্তম। অর্থাৎ ২রা শাওয়াল থেকে ৭ই শাওয়াল পর্যন্ত)। কিন্তু আমাদের ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মতে পৃথক পৃথকভাবে রাখা উত্তম, যাতে রোযা পুরো মাসকে ঘিরে নেয়।

অপর এক হাদীসে রয়েছে- যে ব্যক্তি শাওয়ালের ছয় রোযা রাখবে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাকে বেহেশ্‌তে অত্যন্ত শান-শওকতপূর্ণ শহর দান করবেন। ওই শহরে রক্তবর্ণ ইয়াকূত পাথরের ভবন থাকবে এবং প্রত্যেক ভবনের সামনে দুগ্ধ ও মধুর নদী প্রবাহিত হবে। ফেরেশ্‌তাগণ ওই ব্যক্তিকে আসমান হতে ডেকে ডেকে বলবেন, ''হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আল্লাহ্ পাক তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।''

হাদীসের গাণিতিক ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে- যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করে তার জন্য রয়েছে দশগুণ সাওয়াব। সুতরাং রমযান মাসের ত্রিশ রোযা পালনের পর যদি শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করা হয় তাহলে সর্বমোট সংখ্যা হয় ছত্রিশ। আর এক একটি রোযার পরিবর্তে যদি দশগুণ তথা দশটি রোযার সাওয়াব পাওয়া যায়, তাহলে ছত্রিশ রোযার পরিবর্তে পাওয়া যাবে (৩৬×১০)টি বা ৩৬০টি রোযার সাওয়াব যা আরবী হিসেব মতে পূর্ণ এক বৎসর কিংবা বৎসরের চেয়েও বেশি। তাই বলা হয়েছে রমযানের ত্রিশ রোযার পর শাওয়ালের ছয় রোযা রাখলে সারা বৎসর রোযার সাওয়াব

পাওয়া যাবে। (আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌)

এ ছাড়া বৎসরে আরো কিছু নফল রোযা পালন করা যায়, যাতে রয়েছে অশেষ ফযীলত। যেমন- আশুরার রোযা, প্রতি শুক্রবারের রোযা, শবে বরাত, শবে মি'রাজের রোযা, আরাফাত দিবসের রোযা এবং প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা। প্রসঙ্গক্রমে আইয়্যামে বীদ্ব তথা প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ফযীলত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন মনে করছি।

শায়খ আবূ নসর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিশুদ্ধতম সনদসূত্রে ইমাম যায়নুল আবিদীন রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন- প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩ তারিখের রোযা তিন হাজার বৎসরের রোযার সমান, চৌদ্দ তারিখের রোযা দশ হাজার বছরের রোযার সমান আর পনের তারিখের রোযা এক লক্ষ বৎসরের রোযার সমান।

হযরত আবূ ইসহাক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত জরীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- যে ব্যক্তি নিয়মিত প্রতি মাসে 'আইয়্যামে বীদ্ব' এর এই তিনটি রোযা পালন করবে সে যেন সারা জীবন রোযা পালন করল। কেননা আল্লাহ্‌ পাক পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ করেন- ''মান জা---আ বিল্‌ হাসানাতি ফালাহূ আশারু আমসা-লিহা'' (যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করল তার জন্য রয়েছে দশগুণ সাওয়াব)। সুতরাং এক রোযার পরিবর্তে দশ রোযার সাওয়াব হলে তিন রোযার পরিবর্তে পাবে ত্রিশ রোযা তথা পরিপূর্ণ মাসের। তাই এভাবে প্রতিমাসে নিয়মিত তিনটি করে রোযা রাখলে অনায়াসে সারা জীবন রোযা পালন হয়ে যায়।

[গুনিয়াতুত তালেবীন, ৪৫৯ পৃষ্ঠা]

হযরত মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রয়েছে- একদা দ্বিপ্রহরের সময় আমি নবী করীমের দরবারে হাযির হলাম, তখন তিনি হুজুরা মুবারকে বসা অবস্থায় ছিলেন। আমি প্রথমে সালাম দিলাম আর তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন- ''আলী! ইনি হলেন ফিরিশতাকুল সর্দার হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্‌ সালাম। তোমাদেরকে সালাম দিচ্ছেন। এ কথা শুনে আমি সালামের জবাবে বললাম, ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইহিস্‌ সালাম ইয়া রসূলাল্লাহ্‌।'' হুযূর বললেন, ''তুমি আরো একটু কাছে এসো।'' আমি কাছে গেলাম। এবার নবী করীম বললেন, ''আলী শোন! জিব্রাঈল বলছেন, তোমরা যেন প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা পালন কর।'' কেননা এই তিনটি রোযার প্রথম রোযার বদৌলতে দশহাজার বৎসর, দ্বিতীয় রোযার বদৌলতে ত্রিশ হাজার বৎসর এবং তৃতীয় রোযার বদৌলতে এক লক্ষ বৎসর রোযা রাখার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।'' অতঃপর আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ''এয়া রসূলাল্লাহ্‌! এই মহান ফযীলত কি শুধু আমার জন্য, না সর্বসাধারণের জন্যও? হুযূর জবাব

দিলেন, হ্যাঁ এই ফযীলত তোমার জন্য এবং যারা তোমার মত এই তিনটা রোযা রাখবে তাদের সবার জন্য। (সুবহানাল্লাহ্‌) [গুনিয়াতুত তালেবীন, ৪৫৯ পৃষ্ঠা]

পরিশেষে, শাওয়াল মাসের ছয় রোযা সম্পর্কিত আরো একটি হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছি-

'মাজমাউয্‌ যাওয়াইদ' নামক গ্রন্থের ৩য় খন্ড ৪২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে- হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল অতঃপর শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখল, তাহলে সে গুনাহসমূহ হতে তেমনিভাবে বের হয়ে গেল, যেমন সে আজই মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। (অর্থাৎ তার কোন গুনাহই নেই)।

মোটকথা, রোযার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌ তা'আলার এতই নৈকট্য লাভ করে যে, ওই বান্দার প্রতিটি কাজই মহান আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। এমনটি হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, মহান আল্লাহ্‌ নিজেই এরশাদ করেন- ''রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার কাছে মেশকের সুগন্ধির চেয়েও বেশি পবিত্র।'' পক্ষান্তরে ইবলিস শয়তান রোযাদারকে কেবল ভয় করেনা; বরং রোযাদারের মুখের নাকের নিঃশ্বাস শয়তানকে তীরের মত আঘাত করে।

এক বুযুর্গ ব্যক্তি মসজিদের দরজায় একদা শয়তানকে বিচলিত অবস্থায় দাড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ? শয়তান বলল, ভিতরে দেখুন। তিনি ভিতরে দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি নামায পড়ছে আরেক ব্যক্তি মসজিদের দরজার পাশে শুয়ে আছে। অতঃপর শয়তান বলল ওই যে লোকটি ভিতরে নামায পড়ছে তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্য আমি ভিতরে যেতে চাচ্ছি; কিন্তু যে লোকটি দরজার পাশে শুয়ে আছে সে রোযাদার। এ শয়নকারী রোযাদার যখন নিঃশ্বাস ফেলে তখন তার নিঃশ্বাস আগুনের লেলিহান শিখার মত হয়ে আমাকে আঘাত করছে আর ভিতরে যেতে দিচ্ছে না। সুতরাং বুঝা গেল রোযা শয়তান থেকে বাঁচার একটা অন্যতম ঢালস্বরূপ। তাই বলা হয়েছে ''আস্‌ সওমু জুন্নাতুন'' (রোযা ঢালস্বরূপ)।

তাই কেবল রমযান মাসে নয়, বৎসরের যে কোন সময় নফল রোযা পালন করলে শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। আর কলুষিত আত্মাকে বিশুদ্ধ করা যায়। আর আত্মশুদ্ধিই জাগতিক-পরলৌকিক সফলতার চাবিকাঠি।

আল্লাহ্‌ পাক আমাদেরকে শাওয়াল মাসে ছয় রোযাসহ বৎসরের অন্যান্য নফল রোযা পালন করে তারই নৈকট্য অর্জন করে নি'মাতপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

---><----

নামাযে ইমামের পেছনে মুক্বতাদীর ক্বিরআত পাঠ না করা এবং চুপে চুপে ‘আ-মী-ন’ বলা

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَأْةِ مَعَ الْاِمَامِ فَقَالَ لَاقِرَأَةَ مَعَ الْاِمَامِ فِى شَىءٍ

অর্থাৎ: হযরত আত্বা ইবনে ইয়াসার রদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি একদা হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নামাযের মধ্যে ইমামের সাথে মুক্বতাদীর ক্বিরআত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে হযরত যায়দ ইবনে সাবেত রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইমামের সাথে কোন নামাযেই ক্বিরআত পড়া যাবে না।

[মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড ২১৫ পৃষ্ঠা: হাদীস নম্বর ৫৭৭, নাসাঈ শরীফ ২য় খন্ড ১৬০ পৃষ্ঠা : হাদীস নম্বর ৯৬০, নাসাই : সুনানে কুবরা ১ম খন্ড ৩৩১ পৃষ্ঠা : হাদীস নম্বর ১০৩২, বায়হাক্বী : সুনানে কুবরা ২য় খন্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা : হাদীস নম্বর ২৭৩৮]

প্রসঙ্গিক আলোচনা

কোন কোন মসজিদে লক্ষ্য করা যায় নামাযে ইমামের পেছনে কতিপয় মুসল্লী গুণগুণ করে ক্বিরআত পড়ছে, আর সূরা ফাতিহা শেষে উচ্চ আওয়াজে সমস্বরে বলে ওঠে ‘আমীন’। ইদানিং আমাদের দেশে বিষয়টি লক্ষ করা যাচ্ছে। ফলে সাধারণ মুসল্লীদের মাঝে দেখা দিয়েছে বিভ্রান্তি। হানাফী মাযহাবের ফত্ওয়া মতে উভয়টি নাজায়েয হওয়া সত্ত্বেও কারা এ কাজ দু’টি করছে? তাদের আসল পরিচয় কি? তাদের আক্বীদা কি? সে বিষয়ে সম্মানিত পাঠকদের সমীপে কয়েকটি হাদীস শরীফের উদ্ধৃতিসহ সামান্য আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

ইসলামে তাক্বলীদ ওয়াজিব। অর্থাৎ চার মাযহাবের যে কোন একটি মাযহাবের অনুসরণকেই বলা হয় ‘তাক্বলীদ’। মাযহাবের অনুসারীদেরকে বলা হয় ‘মুক্বাল্লিদ’ আর অমান্যকারীদেরকে বলা হয় ‘গায়র মুক্বাল্লিদ’। ক্ষেত্র বিশেষে এদের নাম ‘লা-মাযহাবী’। আর ‘আহ্লে হাদীস’ নামেও তারা পরিচিত। এরা কোন মাযহাব মানে না, সরাসরি হাদীস থেকে আমল করার দাবি করলেও অনেক সময় সহীহ হাদীস শরীফের বিরোধিতা করতে দ্বিধাবোধ করেনা; যা নিতান্ত গোমরাহী বৈ কিছুই নয়। এদেরকে যেভাবে চেনা যাবে:

১. নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধা
২. রুকূ-সাজদায় যাওয়ার সময় উভয় হাত উত্তোলন করা

৩. সূরা ফাতিহা পাঠের পর উচ্চস্বরে ‘আমীন’ বলা
৪. ইমামের পেছনে ক্বিরআত পড়া
৫. বড় আওয়াজে বিসমিল্লাহ্ পড়া
৬. তারাবীর নামায আট রাক্‘আত পড়া
৭. বিতির নামায এক রাক্‘আত পড়া; ইত্যাদি।

এদের সবচাইতে বড় পরিচয় হচ্ছে এরা ইমামে আ’যম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং তাঁর হানাফী মাযহাবের কট্টর সমালোচক। অথচ হানাফী মাযহাবের প্রতিটি মাসআলা পবিত্র কোরআন-হাদীস সমর্থিত। সত্যিকার বিতর্কে অবতীর্ণ হলে হানাফী মাযহাবের দলীলাদির সামনে তাদের অসারতাই প্রমাণিত হয়েছে বার বার।

আলোচ্য লিখনীতে তাদের বিতর্কিত দু’টি বিষয়ে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের দলীল সহকারে আলোচনা করছি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন হলে, আশা করি, আহ্লে হাদীস দাবীদার গায়রে মুক্বাল্লিদীনরাও সঠিক পথের নির্দেশনা পেয়ে যাবে- ইন্শা আল্লাহ্।

ইমামের পেছনে ক্বিরআত পাঠ

সাধারণত নামাযে ক্বিরআত পাঠ করা ফরয। কিন্তু নামাযী যখন ইমামের সাথে জামাতে নামায পড়ে তখন মুক্বতাদী না সূরা ফাতিহা পড়বে, না অন্য কোন সূরা বা আয়াত মিলিয়ে পড়বে; বরং নামাযের ধ্যানে ইমামের ক্বিরআত মনোযোগ সহকারে শুনবে অথবা চুপ থাকবে। এ বিষয়ে কয়েকটি প্রামাণ্য দলীল আমরা এখন দেখব।

দলীল-১

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থাৎ: যখন ক্বোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা নিবিষ্টচিত্তে শুনবে এবং চুপ করে থাকবে, যাতে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়। -[সূরা আ’রাফ : ২০৪]

প্রখ্যাত মুফাস্সির ইমাম বগভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাফসীরে মা‘আলিমুত্ তানযীল-এ লিখেছেন, একদল আলিম বলেন, উল্লিখিত আয়াতে করীমা নামাযের ক্বিরআত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ ইমামের পেছনে নামাযে ক্বিরআত নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে রয়েছে- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বলেন, যখন ফরয নামাযে ক্বিরআত পাঠ করা হয়, তোমরা তা

শ্রবণ কর এবং চুপ থাক।

ইমাম মুজাহিদ বলেন- রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযে ক্বোরআন তিলাওয়াত করছিলেন তখন তাঁর পেছনে এক আনসারী যুবক ক্বোরআন পাঠ করছিলেন। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়।

ইমাম জালালূদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে দুররে মানসূরে লিখেন- নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে সময় নামাযে কোরআন পাঠ করতেন তখন সাহাবীগণ (মুক্বতাদীগণ)ও ক্বোরআন পড়তেন, তখনই উক্ত আয়াত নাযিল হয়। এরপর হতে যখন নবী-ই আকরাম নামাযে ক্বিরআত পড়তেন, তখন মুক্বতাদীগণ চুপ থাকতেন।

তাছাড়া সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব যুহ্‌রী বলেন- উক্ত আয়াত নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

দলীল-২

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِیْهَا بِالْقِرَاَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَاَ مَعِیْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّیْ اَقُوْلُ مَالِیْ اُنَازِعُ فِی الْقُرْاٰنِ قَالَ فَانْتَهَی النَّاسُ عَنِ الْقِرَاَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِیْهَا جَهَرَ فِیْهِ بِالْقِرَاَةِ مِنَ الصَّلٰوةِ حِیْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, একদা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন একটি নামায হতে অবসর হলেন, যে নামাযে বড় আওয়াজে ক্বিরআত পড়া হয়। অতঃপর পেছনে ফিরে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ আমার সাথে ক্বিরআত পড়েছ? এক ব্যক্তি জবাবে বলল, হ্যাঁ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! নবী করীম বললেন, তাইতো আমি বলছিলাম, আমার কী হল যে কারণে ক্বোরআন তিলাওয়াতে আমি টানা হেঁচড়া অনুভব করছি? হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এ কথা শুনার পর থেকেই লোকেরা নামাযে নবী-ই আকরামের পেছনে ক্বিরআত পড়া ছেড়ে দিলেন।

[সূত্র: সুনানে তিরমিযী ১ম খন্ড ৩৪৪ পৃষ্ঠা, সুনানে আবূ দাউদ ১ম খন্ড ৩১৩ পৃষ্ঠা, সুনানে নাসাঈ ২য় খন্ড ১০৩ পৃষ্ঠা, সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদীস-৮৪৮, মুআত্তা ইমাম মালেক কিতাবুস্ সালাত : হাদীস-১৯৩, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ২য় খন্ড ২৪০, ২৮৪, ২৮৫, ৩০১, ৪৮৭ পৃষ্ঠা, শরহু মা'আনি'উল আসার ১ম খন্ড ২৮০ পৃষ্ঠা]

দলীল-৩

عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِیَ اللّٰهِ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰی خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قِرْاَةَ الْاِمَامِ لَهٗ قِرْاَةٌ.

অর্থাৎ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়ে ওই ইমামের ক্বিরআতই তার ক্বিরআত (হিসেবে যথেষ্ট)।''

[সূত্র: জামে'উল মাসানিদ ১ম খন্ড ৩৩১ পৃষ্ঠা, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ১ম খন্ড ৯৬ পৃষ্ঠা, তাবরানী : মু'জামুল আওসাত ৮ম খন্ড ৪৩ পৃষ্ঠা, বায়হাক্বী : সুনানে কুবরা ২য় খন্ড ১৬০ পৃষ্ঠা]

দলীল-৪

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِیَ اللّٰهِ عَنْهُمَا قَالَ صَلّٰی رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَرَاَ رَجُلٌ خَلْفَهٗ. قَلَمَّا قَضِی الصَّلاَةَ قَالَ اَیُّكُمْ قَرَاَ خَلْفِیْ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ ﷺ مَنْ صَلّٰی خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قِرَاَةَ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاَةٌ ـ رَوَاهُ اَبُوْحَنِیْفَةَ.

অর্থাৎ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্‌ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে নামায পড়ালেন। ওই নামাযে এক ব্যক্তি নবী পাকের পিছনে ক্বিরআত পড়ছিল। নবীপাক নামায শেষে এরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার পেছনে ক্বিরআত পড়েছ? উপস্থিত সবাই নবীপাকের অসন্তুষ্টির ভয়ে চুপ রইলেন; এমনকি নবী করীম প্রশ্নটি তিনবার করলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বলে ওঠলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! আমি। নবী করীম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়ে, ইমামের ক্বিরআতই তার ক্বিরআত।

[সূত্র: মুসনাদে ইমামে আ'যম : কৃত ইমাম হাক্কফী]

দলীল-৫

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِیُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلّٰی جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ.

অর্থাৎ: হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ইমামকে বানানো হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্যই। সুতরাং ইমাম যখন তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বলো, যখন রুকু করে তোমরাও রুকু' কর, যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলবে তখন তোমরা 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলো আর যখন ইমাম সাজদা করে তোমরাও সাজদা করো আর যখন সে বসে নামায পড়ে তখন তোমরাও সবাই বসে নামায পড়।

[সূত্র: বুখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা-২৫৭ হাদীস-৭০১, মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩০৯, হাদীস-৪১৪, আবূ দাউদ শরীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা-১৬৪ হাদীস-৬০২, সুনানে ইবনে মাজাহ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৭৬ হাদীস-৮৪৬, মুসনাদে আহমদ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-৩৬১, হাদীস-৮৪৮৩, সুনানে দারেমী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা-৩৪৩ হাদীস-১৩১১]

এ ছাড়া আরো অনেক দলীল রয়েছে, যা প্রমাণ করে নামাযে ইমামের পেছনে কোন ক্বিরআত পড়া যাবে না।

সূরা ফাতিহার পর উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা

নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলা সুন্নাত। চার ইমাম ও অন্য ফিক্বহ্‌শাস্ত্রবিদদেরও একই অভিমত। যেসব নামাযে চুপে চুপে ক্বিরআত পড়া হয়, সেসব নামাযে যেভাবে নিম্নস্বরে 'আমীন' বলতে হয়, তেমনিভাবে যে সমস্ত নামাযে বড় আওয়াজে ক্বিরআত পড়তে হয়, সে সব নামাযের ক্ষেত্রেও 'আমীন' নিম্নস্বরে বলতে হয়। এটা হানাফী মাযহাবের মাসআলা। এক কথায় সব ধরনের নামাযে ইমাম মুক্বতাদী সবাই চুপে চুপে 'আমীন' বলবে। এ বিষয়ে শরীয়তের কতিপয় দলীল পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি।

দলীল-১

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقَالَ آمِيْنَ وَخَفَّضَ بِهَا صَوْتَهُ. رواه الترمذى والحاكم

অর্থাৎ: হযরত ওয়া-ইল ইবনে হাজর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযে 'গায়রিল মাগদ্বো-বি 'আলায়হিম ওয়ালাদ্ দ্বোয়া----ল্লী-ন' বলার পর নিরবে আমীন বলতেন।

[সূত্র: সুনানে তিরমিযী ১ম খন্ড ২৮৯ পৃষ্ঠা, মুসনাদে আহমদ ৪র্থ খন্ড ৩১৬ পৃষ্ঠা, মুস্তাদরাক লিল হাকেম ২য় খন্ড ২৫৩ পৃষ্ঠা]

দলীল-২

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه اَرْبَعٌ يُخْفِيْنَ عَنِ الْاِمَامِ التَّعَوُّذَ وَ بِسْمِ

اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَآمِيْنَ وَاللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

অর্থাৎ: হযরত ইবরাহীম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, চারটি কাজ ইমামের নিকট থেকে গোপন করতে হয়, আর তা হল- ১. আ'ঊযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানির রজীম, ২. বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, ৩. আমীন এবং ৪. আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ।

অপর হাদীসে রয়েছে হযরত ওমর ও আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা কখনো আ'ঊযু বিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ এবং আমীন বড় আওয়াজে বলতেন না।

-[তাহাভী শরীফ ১ম খন্ড ২৬৩ পৃষ্ঠা]

ইমাম আবূ দাঊদ ত্বায়া-লিসী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা শেষ করে চুপে চুপে 'আমীন' পাঠ করতেন।

উল্লিখিত ক্বোরআন হাদীসের দলীলাদির আলোকে স্পষ্ট প্রমাণিত হল, উপরিউক্ত দু'টি মাসআলা তথা মুক্বতাদী ইমামের পেছনে ক্বিরআত পাঠ না করা এবং সব ধরনের নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের পর চুপে চুপে আমীন বলা হানাফী মাযহাবের মনগড়া কোন দাবি নয় বরং প্রামাণ্য বিধান। মুহাদ্দিস ও ফক্বীহগণের বিশ্লেষণে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সিদ্ধান্ত নির্ভুল, তাঁর উপস্থাপিত দলীলগুলোই অধিকতর বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। তাই তাঁর মাযহাবই শ্রেষ্ঠতম। সুতরাং উল্লিখিত প্রসিদ্ধ দলীলাদির বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে তথাকথিত আহ্‌লে হাদীস লা-মাযহাবীরা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে যে বিভ্রান্তির বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে তা নিতান্তই দুঃখজনক। সুন্নী-হানাফী ওলামা-ই কেরাম যুগে যুগে সাধারণ মুসলমানদেরকে এ ধরনের ইসলামের অপব্যাখ্যাকারীদের ব্যাপারে সতর্ক করে এসেছেন। অতএব বিশুদ্ধ আক্বীদা-আমল গ্রহণ করা তাদের দায়িত্ব। আল্লাহ্ পাক সবাইকে হেদায়ত নসীব করুন। আমীন।।

--><--

কোরবানি ত্যাগের প্রোজ্জ্বল নিদর্শন

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذِهِ الْاَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عليه السلام قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ ـ رَوَاهُ اَحْمَد وَابْنُ مَاجَة

অর্থাৎ হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়কা ওয়াসাল্লাম) এ কোরবানী কি? আল্লাহ্র রসূল এরশাদ করলেন, এটা তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর সুন্নাত। তাঁরা পূণরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কী (উপকার) রয়েছে? আল্লাহ্র রসূল এবার উত্তর দিলেন, ক্বোরবানীর পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি করে নেকী রয়েছে। তাঁরা (আবার) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! (উট, গরু, মহিষ) দুম্বা-ভেড়ার পশমেও কি? হুযূর বললেন, (উট, গরু, মহিষ) দুম্বা-ভেড়ার প্রতিটি পশমের পরিবর্তেও একটি করে সাওয়াব রয়েছে। -[মসনদে আহমদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত শরীফ, ২২৬পৃষ্ঠা]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ক্বোরবানীকে আরবী ভাষায় أُضْحِيَّةٌ (উদ্বহিয়্যাহ্) বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ হল, ওই পশু যা ক্বোরবানীর দিন যবেহ করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পশু যবেহ করাকে ক্বোরবানী বলা হয়।

ক্বোরবানীর বিধান যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ সমস্ত শরীয়তেই বিদ্যমান ছিল। যেমন পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ط فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ط وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۙ

তরজমা: এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি একটা ক্বোরবানী নির্ধারিত করেছি যেন তারা (যবেহ করার সময়) তাঁর প্রদত্ত বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ পশুগুলোর উপর

আল্লাহ্র নাম নেয়; অতএব, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্যই। (সুতরাং শুধু তাঁরই নামে যবেহ কর); সুতরাং তাঁরই সম্মুখে আত্মসমর্পণ করো (নিষ্ঠার সাথে অনুগত অবস্থায়) এবং (হে মাহবূব) সুসংবাদ শুনিয়ে দিন ওই বিনীত লোকদেরকে। -[সূরাহ্ হাজ্ব, আয়াত-৩৪]

বস্তুত হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম এর সন্তান ক্বোরবানী দেওয়ার এ অবিস্মরণীয় ঘটনাকে প্রাণবন্ত করে রাখার জন্যেই উম্মতে মুহাম্মদীর উপরও তা ওয়াজিব করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কোরবানি করুন।" -[সূরা কাউসার, আয়াত-২]

ক্বোরবানির ইতিহাস ও রহস্য মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম'র সাথে সম্পৃক্ত। মহান আল্লাহ্ তাঁকে একের পর এক পরীক্ষা করে সবশেষে নিজের বন্ধু হিসেবে ঘোষণা দেন। প্রথমত নমরূদের মাধ্যমে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের পরীক্ষা। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম চরম ধৈর্যের সাথে মহান আল্লাহ্র উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থার কারণে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর নিজের স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে মরুভূমিতে নির্বাসনের নির্দেশ দেওয়া হলে, তিনি সেই পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হলেন। এভাবে বড় বড় ত্রিশোর্ধ পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। আর প্রতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ্র বন্ধুত্বের আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হন। সবশেষে পরীক্ষা নেওয়া হয়, নিজের প্রাণের টুকরা আদরের সন্তানকে ক্বোরবানীর নির্দেশের মাধ্যমে। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্র রাস্তায় একহাজার বকরী, তিনশ' গাভী এবং একশ' ক্বোরবানী দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার এমন নিদর্শন দেখে মানুষ তো বটে ফেরেশ্তারাও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন! এ অবস্থায় ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম আরো আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, আমার রবের জন্য আমি যা কিছু ক্বোরবানী দিলাম তাতো কিছুই নয়; বরং আমার কাছে যদি একটা সন্তান থাকত তাকেও আমি আল্লাহ্র রাস্তায় ক্বোরবানী দিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতাম। এদিকে অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। আর কথাটিও তাঁর স্মরণের অগোচরে চলে যায়। যখন তিনি পবিত্র ভূমি মক্কাতে পদার্পণ করলেন আল্লাহ্ পাকের দরবারে একটি সন্তানের আবেদন করলে, আল্লাহ্ তাঁর ফরিয়াদ কবূল করে পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দেন। ফলে শিশুপুত্র ইসমা'ঈল আলায়হিস্ সালাম'র জন্ম হয়।

অতি আদর যত্নে লালিত- পালিত শিশু ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম'র বয়স সাত বৎসর মতান্তরে দশ বৎসর কিংবা তের বৎসর হল। ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে

স্বপ্নে বলা হল- ওহে ইব্রাহীম! এবার তুমি তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তুটি আল্লাহর জন্য ক্বোরবানী কর। এভাবে তিন দিন একই স্বপ্ন দেখে নিশ্চিত হলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে স্বীয় পুত্র ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামকে ক্বোরবানীর নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্র নির্দেশমতে শিশুপুত্র ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামকে ক্বোরবানীর যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে মিনাপ্রান্তরে শায়িত করে ধারাল ছুরি বারংবার চালানোর পরও শিশু ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম'র কোমল চামড়া কাটা যাচ্ছিল না। অস্থির মন আর হতাশ হৃদয়ে ভেঙ্গে পড়লেন। তখনি এক পর্যায়ে অনুভব করলেন, ক্বোরবানী হয়ে গেছে। এতক্ষর্ণন্ত যে চক্ষুযুগল বাঁধা অবস্থায় ছুরি চালনা করছিলেন, তা যখন খুললেন, দেখতে পেলেন, তাঁর সামনে একটি দুম্বা যবেহ হয়ে আছে, যা দেখে তিনি আরো বেশি হতবাক হয়ে গেলেন! তখন আওয়াজ এল-

وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يّٰۤاِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ আমি আহ্বান করলাম হে ইব্রাহীম! নিশ্চয় তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছ। এভাবেই আমি পুণ্যবানদের পুরস্কৃত করি।

সেদিন বেহেশ্ত থেকে দুম্বা এনে শিশু ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম'র স্থলাভিষিক্ত করে ক্বোরবানী কবূল করলেন। এরশাদ হয়েছে, وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيْمٍ (আমি তাকে মহান ক্বোরবানী দ্বারা মুক্ত করলাম)। বস্তুতঃ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম'র পুত্র সন্তান ক্বোরবানী দেওয়ার এ অবিস্মরণীয় ঘটনাকে প্রাণবন্ত করে রাখার জন্য উম্মতে মুহাম্মদীর উপর তা ওয়াজিব করা হয়েছে।

পবিত্র হাদীস শরীফে ক্বোরবানীর অসংখ্য ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্র রসূল ইরশাদ করেন, ক্বোরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরবানী দাতার অতীতের গুনাহ্সমূহ মাফ করে দেন।

হযরত মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে ক্বোরবানীর পশু ক্রয়ের জন্য হাট-বাজারের ফযীলতের বর্ণনাও এসেছে এভাবে- পশু ক্রয়ের জন্য যে ঘর হতে বের হয়, তার প্রত্যেক কদমের পরিবর্তে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়। বাজারে পৌঁছার পর ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যখানে যা কথাবার্তা হয়, সবগুলোই আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ্ হিসেবে গণ্য করা হয়।

অপর হাদীসে ক্বোরবানীর জন্য ক্রীত পশুকে সম্মান করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে-

عَظِّمُوْا ضَحَايَاكُمْ فَاِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ক্বোরবানীর জন্তুকে সম্মান কর। কেননা ওটা পরকালে পুলসেরাত্বের উপর তোমাদের বাহন হবে।

উল্লেখ্য, মুসলমানদের নেক আমলসমূহের মধ্যে ক্বোরবানী একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আমল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সব সময় ক্বোরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। যেমন- ইবনে মাজাহ্ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يَضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ''সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ক্বোরবানী করেনা, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।''

পরিশেষে বলতে হয়, ক্বোরবানীর বিশাল নি'মাতের মূল কারণ হল, এতে বান্দার পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ্র প্রতি মুহাব্বতের এক প্রোজ্জ্বল নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। 'ক্বোরবানী' ত্যাগের চরম নিদর্শনসমূহের অন্যতম। যা শুধুমাত্র পশু যবেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মনের পশু যবেহ করতে না পারলে কোরবানি করার সার্থকতা নেই। আল্লাহ্ আমাদের কুপ্রবৃত্তির-রিপুসমূহ দমন করার তাওফীক্ব দান করুন; আমীন।

---><---

সাতটি চরিত্র মানুষকে ধ্বংস করে দেয়

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ. قَالُوْا یَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْکُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی وَالسِّحْرِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَکْلِ الرِّبٰوا وَاَکْلُ مَالَ الْیَتِیْمِ وَالتَّوَلِّیْ یَوْمَ الزُّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ. متفق علیه.

অনুবাদ

হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ধ্বংসকারী সাতটি কাজ হতে তোমরা বিরত থাক। সাহাবীগণ আবেদন করলেন, এয়া রসূলাল্লাহ্! সেগুলো কি কি? নবী করীম এরশাদ করলেন, ১. মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করা, ২. যাদু করা, ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, তবে শরীয়ত মোতাবেক হত্যা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার নিরিখে বৈধ। ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, ৬. যুদ্ধের ময়দানে থেকে পলায়ন করা ৭. সতী-সাধ্বী ও উদাসীন মুসলিম নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া। [বুখারী ও মুসলিম শরীফের সূত্রে মিশকাত শরীফ ১৭ পৃষ্ঠা]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

একজন মানুষের জন্য তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যেমন দায়িত্ব, তেমনি তার ঈমান-আক্বীদার হেফাযত করা তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। অপর এক হাদীসে ধ্বংসকারী চরিত্রের সংখ্যা ১৭টি বলা হলেও মূল বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে অভিন্নতা। সুতরাং ওই হাদীসে বর্ণিত ১৭টি বিষয়ের মধ্যে ৪টির সম্পর্ক অন্তরের সাথে। ১. শিরর্ক ও কুফর, ২. গুনাহ্র উপর অটল থাকা, ৩. রহমত হতে হতাশ হওয়া, ৪. আল্লাহর শাস্তি হতে নির্বিঘ্ন থাকা।

পরবর্তী চারটির সম্পর্ক মুখের সাথে: ১. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, ২. ব্যাভিচারের অপবাদ দেওয়া, ৩. ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম করা, ৪. যাদু করা। এর পরবর্তী তিনটির সম্পর্ক পেটের সাথে। ১. মদ্যপান, ২. ইয়াতীমের সম্পদ হরণ, ৩. সুদ খাওয়া। পরবর্তী দু'টির সম্পর্ক লজ্জাস্থানের সাথে, ১. ব্যভিচার, ২. বলাৎকার। পরবর্তী দু'টির সম্পর্ক হাতের সাথে, ১. অন্যায়ভাবে হত্যা করা, ২. চুরি করা।

পরবর্তী একটি পায়ের সাথে সম্পর্কিত: ১. কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ময়দান হতে ফিরে আসা। সর্বশেষ চরিত্র সমগ্র শরীরের সাথে। আর তা হল, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া এবং তাদের সাথে বেআদবী করা।

মহান আল্লাহ্ অনাদি এবং অনন্ত। তাঁর কোন শুরু নেই এবং শেষও নেই। তিনি স্বয়ং স্রষ্টা। কেউ তাঁকে সৃষ্টি করেনি। সত্তাগতভাবে তিনি সকল বস্তুর স্রষ্টা ও মালিক। তিনি যেমন অবিনশ্বর তেমনি তাঁর গুণাবলীও অবিনশ্বর। সুতরাং সত্তাগতভাবে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা শিরক। পক্ষান্তরে তাঁর কতিপয় গুণ বা গুণবাচক নাম তাঁর প্রিয় নবী অথবা প্রিয় বান্দার জন্য ব্যবহার ইসলামী পরিভাষায় লক্ষ করা যায়। এমনকি পবিত্র ক্বোরআনেও পরিলক্ষিত হয় এটা শিরক নয়। কারণ ওই সব গুণবাচক নাম কিংবা গুণাবলী আল্লাহ্ প্রদত্ত, সত্তাগত নয়। যেমন- রহীম, আযীয, রঊফ, করীম ইত্যাদি। এগুলো যেমনিভাবে আল্লাহর গুণবাচক নাম, তেমনি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামর জন্যও ব্যবহৃত হয়।

কিছু লোক 'এয়া রসূলাল্লাহ্' 'এয়া শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী' ইত্যাদি বলাকে শিরক ফতোয়া দিয়ে থাকে। তাদের ধারনা দূরবর্তী কাউকে ডাকা শিরক। না'ঊযু বিল্লাহ্!

দূরবর্তী কাউকে ডাকলে যদি শিরক হতো তাহলে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কেন হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামকে শিরক শিক্ষা দিলেন? যেমন এরশাদ হচ্ছে- 'ওয়া আযযিন ফিন্ না-সি বিল্ হাজ্জ অর্থাৎ তুমি মানুষের কাছে ঘোষণা দিয়ে দাও। যে সমস্ত লোকদেরকে সেদিন হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম আহ্বান করেছিলেন, তারা কাছে কেউ ছিল না; বরং পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছিল। সুতরাং পবিত্র কোরআনই প্রমাণ করে দিল, দূরবর্তী কাউকে ডাকা শিরক নয়।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- قُلْ یٰٓاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا অর্থাৎ ''হাবীব! আপনি বলুন! হে লোকেরা! আমি তোমাদের সকলেরই কাছে আল্লাহর রসূল হয়ে প্রেরিত।'' এখানেও গায়েবী ডাক দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নামাযের প্রথম বৈঠক ও শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের মধ্যে ''আস্ সালামু আলায়কা আইয়ুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ'' বলা হয়। এতেও কি তাদের মতে শিরক হবে? তারা এ বাক্য দিয়ে নবীকে দূর থেকে সালাম দেয়, নাকি কাছে থেকে সালাম দেয়। যদি বলে কাছে থেকে সালাম দেয়, তাহলে তারা মেনে নিল নবী হাজির-নাজির; যা তাদের ভ্রান্ত আকীদা মতে নাজায়েয। আর যদি বলে দূর থেকে সালাম দিই। তাহলে তো মারাত্মক। অর্থাৎ নিজের ফতোয়ায় নিজে মুশরিক হয়ে গেল।

২. যাদু করা: যাদু শিক্ষা করা এবং যাদুর মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দেয়া উভয়টিই হারাম। এটা শয়তান এবং কাফিরদের কাজ। নবী করীম এরশাদ করেন, ''যে যাদু করে এবং যে অন্যকে দিয়ে যাদু করায়, তারা আমার উম্মত নয়।'' ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন যাদুকারী কাফির।

৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা: অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা চরম অপরাধ। পবিত্র ক্বোরআনে এর শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামের আযাব বলা হয়েছে।

৪. সুদ খাওয়া : ক্বোরআনে করীমের দলীল মোতাবেক সুদ খাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। এ কথার অস্বীকারকারী তথা সুকে হালাল মনে যে খায় সে কাফির। এ ছাড়া সুদের কতিপয় খারাপ দিক রয়েছে। সুদখোরের অন্তরের কোন ধরনের মমতা থাকেনা, সাম্য-মৈত্রীর কোন প্রভাবই তার অন্তরে থাকে না। এরা কোন প্রয়োজনীয় কাজেও টাকা ব্যয় করে না। এরা যাকাত আদায় করে না। অনুরূপভাবে দান-সাদকার নিকটেও যায়না। সুদখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِى مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْن. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فاذنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلِه.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সুদের অবশিষ্ট সম্পদ ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ্ এবং রসূলের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। -[সূরা বাক্বারা]

৫. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা: ধ্বংসকারী চরিত্রের আরেকটি হলো ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَال الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصلُوْنَ سَعِيْرًا.

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলে তারা যেন আগুন দ্বারা নিজেদের পেট পূর্ণ করলো এবং অচিরেই নিশ্চয় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৬. যুদ্ধের ময়দান হতে ফিরে আসা: কাফির-বেদ্বীনদের জুলুম-অত্যাচার হতে ইসলাম ও মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য জিহাদ করা ফরয। এ ধরনের ফরয জিহাদের ময়দান হতে কেউ কাপুরুষের মত পালিয়ে আসা মারাত্মক অপরাধ এবং এটা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।

৭. সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া: সতী-সাধ্বী ও উদাসীন মহিলাদের প্রতি যিনার অপবাদ দেয়া কবীরা গুনাহ্।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে উল্লিখিত ধ্বংসাত্মক সাতটি খারাপ চরিত্র হতে হিফাযত করুন। আমীন।

হাদীস শরীফ চর্চাকারীদের জন্য নবী করীমের দো'আ

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِA يَقُوْلُ نَضَّرَاللّٰهُ اِمْرأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ ـ

অনুবাদ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ্ পাক সে ব্যক্তিকে সজীব রাখুন, যে আমার কথা (হাদীস শরীফ) শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবে (হুবহু) অন্যজনের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। অনেক সময় এরূপ হয় যে, মূল হাদীস শ্রবণকারীর চেয়ে যাদের কাছে বর্ণনা করা হয় তাদের অনেকে অধিক বোধসম্পন্ন ও সংরক্ষণকারী হন।

বর্ণনাকারী

নাম 'আবদুল্লাহ্, পিতার নাম 'মাস'ঊদ', উপনাম 'আবূ আবদুর রহমান আল্ হুযালী'। মুস্তাদরাকে হাকেম ও ইবনে সা'দের বর্ণনামতে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দারুল আরক্বামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনকি তিনি নিজেই বলতেন, আমি ষষ্ঠ মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

ইসলাম গ্রহণের পর হতে প্রায় সময়ই তিনি নবী করীমের সফরসঙ্গী হতেন এবং নবী-ই পাকের ওযূ'র পানি, মিসওয়াক এবং জুতা মুবারক বহন করতেন। অসীম সাহসী এ সাহাবী সকল জিহাদে অংশ গ্রহণ করে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন, এমনকি পরবর্তীতে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত আমলে ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

৬৪০ খ্রিস্টাব্দে (২০ হিজরি) সনে তিনি কুফার কাযী নিযুক্ত হন। একই সঙ্গে বাইতুল মাল, ধর্মীয় শিক্ষা ও মন্ত্রীত্বের দায়িত্বও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস শরীফের সংখ্যা ৮৪৮। হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমসহ প্রসিদ্ধ সাহাবীরা হাদীস বর্ণনা করেন।

হিজরি ৩২ মতান্তরে ৩৩ সনে নবীপ্রেমে নিবেদিত এই সাহাবী ইন্তিকাল করেন। হযরত উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন। আর

জান্নাতুল বাক্বীতে হযরত উসমান ইবনে মযউন রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যুগে যুগে যাঁরা হাদীস শরীফের খিদমতে আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। আলোচ্য হাদীস শরীফে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জন্য বিশেষ দু'আ করেছেন। আর তাঁর প্রত্যেকটি দু'আই মহান আল্লাহর দরবারে নিঃসন্দেহে কবূল। এ কথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে, নবীজীর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীসমূহ দীর্ঘ দেড় সহস্র বৎসর পরেও আমরা নিখুঁতভাবে পেয়েছি, পাচ্ছি তা খুব সহজে হয়নি; বরং এর পেছনে ছিল একঝাঁক নিবেদিতপ্রাণ মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রম।

হাদীস সঙ্কলনের দীর্ঘ ইতিহাস উপস্থাপন করার অবকাশ নেই কলেবরের সীমাবদ্ধতার কারণে। কিন্তু যেটুকু না বললেই নয়, হাদীস সঙ্কলনের প্রাথমিক পদ্ধতি ছিল শুনে মুখস্থ করে রাখা আর অপর ব্যক্তির কাছে বর্ণনার মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া।

প্রাথমিক যুগে হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ নিষিদ্ধ করা ছিল। কারণ, তখনো পবিত্র ক্বোরআন নাযিল সমাপ্ত হয়নি। ধাপে ধাপে পবিত্র ক্বোরআনের বাণী অবতীর্ণ হচ্ছিল আর সাহাবীরা তা লিপিবদ্ধ করছিলেন। এমতাবস্থায় হাদীস শরীফগুলোও যদি লিপিবদ্ধ হত, তাহলে উভয়টি মিশ্রিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। আর উভয়ের মাঝে পৃথক করতে গিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হতো।

পরবর্তীতে পবিত্র ক্বোরআন পরিপূর্ণ সঙ্কলন হয়ে যাওয়ার পর মূলত: হাদীস সঙ্কলনের কর্মসূচি শুরু হয়। নবী করীমের বাণী ''আমার পক্ষ হতে একটি বাণী হলেও তোমরা অন্যের নিকট পৌছিয়ে দাও'' -এ হুকুম বাস্তবায়নে একদল লোক এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের নাম 'মুহাদ্দিস' (হাদীস চর্চাকারী)। তাঁরা অত্যন্ত সূক্ষ্ম নজর দিয়ে যাচাই-বাছাই করে হাদীস সঙ্কলন করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হাদীসসমূহ উপস্থাপনের গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন। পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

هُوَالَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْامِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ O وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ O ﴿سورة جمعه: ٢-٣ آيه﴾

অর্থাৎ: ''তিনিই হন (সেই সত্তা), যিনি উম্মী লোকদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে

একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করেন এবং নিশ্চয় তারা ইতোপূর্বে অবশ্যই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ছিল; এবং তাদের মধ্য থেকে অন্যান্যদেরকে পবিত্র করেন এবং জ্ঞান দান করেন তাদেরকে, যারা ঐ পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হয়নি; এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।''
-[সূরা জুমু'আহ : ২-৩ আয়াত]

আয়াতের মর্মার্থ হল, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা-ই কেরাম'র পরবর্তীদের জন্য ও সকলের জন্য শিক্ষাদাতা। তিনি ক্বোরআনের মর্মার্থ ও নির্দেশনা সাহাবা-ই কেরামের সামনে উপস্থাপন করতেন। যেমন এরশাদ হয়েছে-

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ O

''এবং (হে মাহবূব!) আমি আপনার প্রতি এ 'স্মৃতি' অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি লোকদের নিকট বর্ণনা করেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাতে তারা তাতে চিন্তাভাবনা করে।'' -[সূরা নাহল : ৪৪ আয়াত]

বুঝা গেল, নবী করীমের দায়িত্ব হল কোরআনে করীমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মানুষের সামনে তুলে ধরা; আর উম্মতের দায়িত্ব হল- সেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ভালভাবে শ্রবণ করে তা যথাযথ বাস্তবায়ন করা আর তা মহান আল্লাহ্র নির্দেশও বটে-

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র
এবং আনুগত্য কর রসূলের।

বলাবাহুল্য, পবিত্র ক্বোরআনে প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে, আর তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিবরণ রয়েছে হাদীস শরীফে। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচি, ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদির বিধি-বিধান, হজ্বের নিয়মাবলী, তাছাড়া মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ্র প্রিয় রসূল দিয়েছেন (হাদীস শরীফের মাধ্যমে)।

পবিত্র কোরআন শরীফে এরশাদ হয়েছে اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর) কিন্তু সে নামাযের কাঠামো, পদ্ধতির সব বিবরণ ক্বোরআন শরীফে নেই, রয়েছে হাদীস শরীফে।

সুতরাং এককথায় বলতে হয় আমাদের জীবনের বিরাট অংশ নির্ভর করছে পবিত্র হাদীসের উপরই। আর সেই হাদীসসমূহ যাদের বর্ণনা, লিখনী ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে আমরা তাঁদের কাছে কতটুকু ঋণী তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। এরা মুসলিম মিল্লাতের মহান দিকপাল।

যুগে যুগে মুসলিম প্রজন্মের হৃদয়ে এদের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয়-বরণীয়, লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্য হতে এরা নির্বাচিত। ইসলামী জ্ঞানসমুদ্রের তলদেশ হতে অমূল্য রত্নআহরণকারী সেসব বীরডুবুরী মহামনীষীদের মধ্যে যাদের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারণ করতে হয় তন্মধ্যে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনে মাজাহ্, ইমাম মালিক, ইমাম মুহাম্মদ প্রমুখ। কারণ তাঁরা নিজেদের জীবনোৎসর্গ করে করে মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন হাজার হাজার হাদীস শরীফ তথা সিহাহ্ সিত্তাসহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব। তাঁদের প্রচেষ্টায় আজ বিশ্বের আনাচে-কানাচে নবীজীর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী পৌঁছে গেছে এবং সেসব হাদীস এখনো দিয়ে যাচ্ছে দিকভ্রান্ত মানুষকে হিদায়াতের আলোকরশ্মি।

যুগে যুগে যাঁরাই হাদীস শরীফের খিদমত করেছেন তাঁদের উপর ছিল মহান আল্লাহ্র বিশেষ রহমত। যেহেতু নবী করীম তাঁদের জন্য খাসভাবে দো'আ করেছেন। আবার সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা ইল্মের খিদমত করার আগ্রহী ছিলেন তাঁদের জন্য বিশেষভাবে দো'আ করতেন এবং উৎসাহ প্রদান করতেন। যেমন- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবীর স্মরণশক্তি বৃদ্ধি, মেধাশক্তি বৃদ্ধির জন্য দো'আ করা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ইতিহাসের পাতায়। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দো'আর বরকতে ইল্মে হাদীসের খাদিমগণ পরিগণিত হয়েছেন বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস হিসেবে। পারলৌকিক সফলতা তো আছেই দুনিয়ার বুকেই আল্লাহ্র দরবারে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতার দৃষ্টান্ত প্রকাশ পায়।

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হাদীস সঙ্কলনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা থেকে অনুমিত হয়, তিনি প্রত্যেকটি হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ করার পূর্বে কমপক্ষে একবার করে নূর নবীর যিয়ারত লাভে ধন্য হতেন। তাহলে বলতে পারি, সহীহ বুখারী শরীফে যতসংখ্যক হাদীস শরীফ রয়েছে, ততবারই নবী-ই করীমের যিয়ারত নসীব হয়েছে। একজন ঈমানদারের জন্য এর চেয়ে বড় নি'মাত আর কী হতে পরে? আর ইন্তিক্বালের পর তাঁর কবরের মাটি হতে মিশ্ক আম্বরের চেয়ে বেশি সুগন্ধি বেরুচ্ছিল। এভাবে আরো অনেক কারামত এসবই একমাত্র ইল্মে হাদীসের খিদমতের কারণে। মুহাদ্দিসদের জীবনীতেও দেখা যায় তদ্রূপ বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ও নি'মাতপ্রাপ্তির বর্ণনা।

হাদীস সঙ্কলনের প্রাথমিক যুগে ইমাম বুখারী একেকটা হাদীস সংগ্রহের জন্য মিসর, খোরাসান, হিজায, নিশাপুর ইত্যাদি এলাকায় ভ্রমণ করতেন। আর দিনের

পর দিন ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তারপরও অদম্য স্পৃহা নিয়ে ইল্মে হাদীসের খিদমতে সম্মুখপানে এগিয়ে গেছেন।

হযরত আমর ইবনে আবূ সালমা ইমামুল হাদীস ইমাম আউযা'ঈ রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র কাছে হাদীস শুনতে গিয়ে দীর্ঘ চার বৎসর তার সান্নিধ্যে কালাতিপাত করে মাত্র ত্রিশটা হাদীস শুনতে পান এবং তা সংগ্রহ করেন। পরিশেষে হতাশার সূরে বলে ফেললেন- আমি আপনার খিদমতে দীর্ঘ চার বৎসর কাল অতিবাহিত করলাম, অথচ মাত্র ত্রিশটা হাদীস শরীফ সংগ্রহ করলাম।

জবাবে ইমাম আউযাঈ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বললেন- তুমি চার বৎসরে ত্রিশখানা হাদীস কি কম মনে করছ? অথচ তুমি কি জান যে, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কেবল একটি হাদীস শরীফ সংগ্রহের জন্য সুদূর মিসর সফর করেছিলেন। আর সেই সফরের জন্য একটি বাহন (জানোয়ার) ক্রয় করে তার উপর আরোহন করেই মিসর গিয়ে হযরত ওক্ববা ইবনে আমির রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করে ওই একটি মাত্র হাদীস শরীফ সংগ্রহ করে পুনরায় মদীনা শরীফে ফিরে আসেন? সে ক্ষেত্রে চার বৎসরে ত্রিশটা হাদীস শরীফ সংগ্রহ করা অনেক বড় নি'মাত।

সাহাবা-ই কেরাম হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশে দূর দূরান্তে সফর করাকে নিজেদের জীবনের অংশ মনে করতেন। এমনকি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন- হাদীস সংগ্রহকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত একজোড়া লোহার জুতা বানিয়ে নেয়া। যাতে মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর চলতে পারেন। বীর ডুবুরি যেমন একটা মুক্তার সন্ধানে অনেক কষ্ট সহ্য করে দুঃসাহসিক অভিযানে এগিয়ে যায়; তার চেয়েও অনেক গুণ বেশি আকর্ষণ নিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরাম আল্লাহ্র মাহবূবের নূরানী হাদীস শরীফসমূহ সংগ্রহ করে একত্রিত করেছেন, যা বর্তমানে আমরা খুবই সহজে পেয়ে যাচ্ছি।

আমরা তাদেরকে স্মরণ করছি, গভীর শ্রদ্ধার সাথে। যেহেতু আমরা তাদের ঋণের পাশে আবদ্ধ। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করচি সেই সব মহান ব্যক্তিত্বকে, যারা রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে পূর্ববর্তীদের সঙ্কলিত হাদীসসমূহের মর্ম সাধারণ ছাত্রদের মাঝে উপস্থাপন করে আসছেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ বের করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে শরীয়ত-তরীকত-হাকীকত-মা'রিফাত'র জ্ঞান উপহার দিয়ে আসছেন।

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হাদীসমূহের মহাসমুদ্রে বিন্দু বিন্দু বারিধারা আমাদের দেশেও এসেছে মনীষীদের মাধ্যমে। বাংলাদেশে ইল্মে হাদীসের খিদমতের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য যে সমস্ত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যুগ

যুগ ধরে অশেষ অবদান রেখে আসছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে অবস্থান করছে এশিয়াখ্যাত অন্যতম দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের প্রাণকেন্দ্র আউলিয়া-ই কেরামের শহর চট্টলার বুকে কুতবুল আউলিয়া আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী রহমাতুল্লাহি আলায়হির পবিত্র হাতে প্রতিষ্ঠিত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ এখানে পাঠদান করে আসছেন। ফলে, এখান থেকে 'ফারেগ' হওয়া ছাত্ররা দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে কোরআন-সুন্নাহ্র নিরলস খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন, যা সারাবিশ্বে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বললে অত্যুক্তি হবেনা। এ প্রতিষ্ঠানে ইল্‌মে হাদীসের খিদমত করে যারা পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন তাঁরা ছিলেন নবীপ্রেমে এ যুগের ওয়াইস ক্বরনী, জ্ঞান-গরীমায় এ যুগের ইমাম রাযী-গাযালী, তাসাউফ চর্চায় এ যুগের রূমী, আত্তার, সাহিত্য চর্চা, লিখনী, বক্তব্য, বিবৃতি, তাক্বওয়া-পরহেযগারী ইত্যাদিতে তারা জাতির জন্য নিঃসন্দেহে অনন্য মডেল।

তাঁদের হাতে গড়া ছাত্ররা বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখক, গবেষক, আলিম, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ-মুফ্‌তী, শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সির জাতির শ্রেষ্ঠসন্তান জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় এদের বিচরণ লক্ষণীয়। বিজয় অভিযানে এরা গাযী সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর মত সফল দৃষ্টান্ত। লেখনীর ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানের কৃতী ছাত্ররা এগিয়ে আছেন। পবিত্র ক্বোরআন হাদীস, ফিক্বহ-ফাত্‌ওয়া ও যুগোপযোগী যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানে তারা 'আ'লা হযরত আহমদ রেযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র আদর্শের অনুসারী।

বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে যাঁরা পাঠদানে রত আছেন, তাঁদের জ্ঞান-গরিমা, প্রাজ্ঞতা, বাগ্মিতা, সাবলীল উপস্থাপনা, দক্ষতা ঈর্ষণীয়। যামানার মহান সাধক যে উদ্দেশ্যকে

সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন করেছিলেন, আজ সে পল্লবিত বাগান ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে বিশ্বময় সুবাস ছড়াচ্ছে। আল্লাহ্ পাক এ বাগানকে চিরআবাদ ও নিরাপদ রাখুন; আ-মীন।

---><---

প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ اِبْنَ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَا مَكُمْ مِنْكُمْ . (متفق عليه)

অনুবাদ

হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সেদিন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যেদিন মার্‌ইয়াম তনয় হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হতে আবির্ভূত হবেন?

-[সহীহ বুখারী : হাদীস নং-৩২৬৫, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ১৫৫, সহীহ ইবনে হিব্বান : হাদীস নং ৬৮০২, ফাতহুল বারী : ৪৯৩/৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইলমে গায়বের অধিকারী আমাদের প্রিয় নবী হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌মে গায়বের আলোকে আপন উম্মতদেরকে সতর্ক করেছেন ঈমানবিধ্বংসী বিভিন্ন বিষয়, ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী সম্পর্কে, তুলে ধরেছেন ক্বিয়ামতের বিভীষিকাময় চিত্র। তেমনিভাবে উম্মতের কাণ্ডারী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইলমে গায়বের আলোকে শুনিয়েছেন আশার বাণী, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন খোদায়ী সাহায্যের। তেমনি একটি মহান প্রতিশ্রুতি হযরত ইমাম মাহ্‌দী আলায়হিস সালাম। তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে হাদীস শাস্ত্রে। নিম্নে আমরা ইমাম মাহদী আলায়হিস সালামের পরিচয় তিনি কখন কিভাবে এবং কেন আবির্ভূত হবেন সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়াস পাব ইন্‌শা আল্লাহ্।

হাদীসের আলোকে ইমাম মাহ্‌দী

আক্বা ও মাওলা নবীকুল শিরমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত মুক্তাসদৃশ্য অমীয়বাণী মহান পবিত্র হাদীস শরীফে ইমাম মাহ্‌দী আলায়হিস সালামের আগমনের প্রতিশ্রুতিসহ নাম পরিচয় এবং বিভিন্ন গুণাবলী স্থান পেয়েছে সুস্পষ্টরূপে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمْلِكَ

الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ اِسْمُهُ اِسْمِىْ.

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- ক্বিয়ামত তখন পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না আমার আহ্লে বায়্তের এক মহান ব্যক্তিত্ব আরবের বাদশাহ হবেন, তাঁর নাম হবে আমার নাম মুতাবেক।

-[তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং ২২৩, সুনানি আবূ দাঊদ : হাদীস নং ৪২৮২, মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ৪২৭৯, মু'জামুল কাবীর : হাদীস নং ২২৩, মুসতাদরেক : হাদীস নং ৮৩৬৪]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﵁ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَلِىْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ اِسْمُهُ اِسْمِىْ قَالَ عَاصِمٌ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمَ يُطَوِّلُ اللّٰهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ حَتّٰى يَلِىَ.

অর্থাৎ: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্'ঊদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আমার আহলে বায়ত হতে এক ব্যক্তি খলিফা হবেন, যার নাম আমার মত হবে। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে আছে যে, ক্বিয়ামত হতে যদি শুধুমাত্র একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা ওই দিনকে এতবেশি বরকতময় করে দেবেন যে, ওই একদিনেই ইমাম মাহ্দী আলায়হিস সালাম খলীফা হয়ে যাবেন।

-[তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং ২২৩১, সুনানে আবূ দাঊদ : হাদীস নং ৪২৮২, মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ৩৫৭১, মু'জামুল কাবীর : হাদীস নং ১০২১৫]

عَنْ عَلِىٍّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَهْدِىُّ مِنَّا اَهْلُ الْبَيْتِىْ يُصْلِحُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ لَيْلَةٍ.

অর্থাৎ হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাজেদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইমাম মাহ্দী আমার আহলে বায়ত হতে আবির্ভূত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এক রাতের মধ্যে সালেহ বানিয়ে দেবেন। (এখানে সালেহ বলতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এক রাতেই বেলায়তের এমন উচ্চ মক্বামে পৌঁছিয়ে দিবেন যে, যা তার বহু প্রত্যাশিত।)

-[ইবনে মাজাহ : ৪০৮৫, মুসনাদে আহমদ : ৬৪৫]

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمَهْدِىُّ مِنْ عُنْوَانِىْ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ

অর্থাৎ হযরত উম্মে সালামাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, ইমাম মাহ্দী আমার বংশ আমার কন্যা ফাতিমার সন্তানদের মধ্য হতে (আবির্ভূত) হবে।

-[আবূ দাঊদ শরীফ : ৪২৮৪]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَزَالُ الْاِسْلَامُ عَنْ يَرَا اِلٰى اِثْنٰى عَشَرَ خَلِيْفَةَ ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ اَفْهَمْهَا لِأَبِىْ مَا قَالَ؟ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

অর্থাৎ হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, বার জন খলীফা পর্যন্ত ইসলাম বিজয়ী থাকবে। এরপর একটি কথা আমি বুঝতে পারিনি। অতঃপর আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী এরশাদ করেছেন? তিনি বললেন, তাঁরা প্রত্যেকেই কোরাইশ বংশোদ্ভুত।

-[মুসলিম শরীফ : ১৮২১, মুসনাদে আহমদ : ২১০৫৮]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ ن الْخُدْرِىِّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَهْدِىُّ مِنِّىْ اجْلَى الْجَبْهَةِ اَقْنَى الْاَنْفِ يَمْلَاُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَّعَدْ لاَ كَمَا مِلَئَتْ ظَلْمًا وَجُوْرًا وَيَمْلِكُ سَبْعَ سَنِيْنَ .

অর্থাৎ হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- মাহ্দী আমার বংশ হতে। তার চেহারা খুব নূরানী আলোকময়, তার নাক হবে সুতীক্ষ্ণ। সে পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। যেমন তার পূর্বে পৃথিবী অন্যায় ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ ছিল।

-[আবূ দাঊদ : ৪২৮, মুসতাদরেকই হাকেম : ৮৪৩৮]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ ن الْخُدْرِىَّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقُوْمَ السَّاعَةُ حَتّٰى تَمْلاً اَلْاَرْضُ ظُلْمًا وَجُوْرًا وَعَدُوَانَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ مَنْ لملاما قِسْطًا وَعَدْلاً.

অর্থাৎ হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না পৃথিবী অন্যায়-অবিচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, অতঃপর আমার

আহ্‌লে বায়ত থেকে এক ব্যক্তি (মাহ্‌দী) আবির্ভূত হবে যে, দুনিয়ার ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। -[মুসতাদরাকে হাকেম : হাদীস নম্বর-৮৬৬৯]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ وُلْدُ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَنَا وَهَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَهْدِيُّ.

অর্থাৎ হযরত আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, আমরা আবদুল মুত্তালিবের সন্তান, জান্নাতের সর্দার হবো অর্থাৎ আমি (রসূলুল্লাহ), হযরত হামযা, হযরত আলী, হযরত জাফর, হযরত হাসান, হযরত হুসাইন এবং হযরত মাহ্‌দী আলায়হিমুস্ সালাম। -[ইবনে মাজাহ : হাদীস-৪০৮৭]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির নিকট জনৈক ব্যক্তি জানতে চাইলেন- ক্বিয়ামত কখন হবে এবং ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব কখন হবে? কোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতিসহ নাতিদীর্ঘ বক্তব্য দেওয়ার পর পরিশেষে আ'লা হযরত জবাব দিলেন আমার মনে হয় হিজরি ১৮৩৭ সনের পর কোন ইসলামী রাষ্ট্র অবশিষ্ট থাকবে না এবং ১৯০০ হিজরি সনে ইমাম মাহ্‌দীর আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে। তিনি আরো বলেন আমি ধারণাটুকু অর্জন করেছি সাইয়্যেদুল মুকাশিফীন শায়খে আকবার ইমাম মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দর্শন হতে।

---><---

ওলীবিদ্বেষীরা খোদাদ্রোহী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادَلِى وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُ)

অনুবাদ

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন- যে আমার ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

(বুখারী শরীফ)

হাদীস শরীফের বর্ণনাকারী

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রদিয়াল্লাহু আনহু নবীপ্রেমে নিবেদিত প্রাণ সাহাবী ছিলেন। হিজরি সপ্তমবর্ষে ইসলাম গ্রহণ করার পর হতে সারাক্ষণ নবীজীর দরবারে পড়ে থাকতেন। তাই অল্প সময়েই অধিক পরিমাণ হাদীস শরীফ বর্ণনাকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস শরীফের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। সর্বাধিক হাদীস শরীফ বর্ণনাকারী এই সাহাবীর আসল নাম ছিল 'আবদুর রহমান'। তাঁর আস্তিনের ভেতর হতে একটি বেড়ালছানা বের হয়ে আসতে দেখে নবীজী আদর করে তাঁকে ডাকলেন 'ইয়া আবা হুরায়রাহ্' (বিড়ালছানার বাবা)। নবীপ্রেমে উৎসর্গিত সাহাবী সে থেকে পূর্বের নাম বাদ দিয়ে নবীজীর পবিত্র মুখ নিঃসৃত নাম নিয়েই সবার কাছে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন। স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে প্রথম অবস্থায় হাদীস শরীফ শুনে মুখস্থ রাখতে পারতেন্ না, বিধায় বিষয়টি নবীজীর দরবারে উত্থাপন করলে নবীজী তাঁকে বললেন- তোমার চাদরখানা বিছাও। অতঃপর ওই চাদরে নবীজী থুথু মুবারক দিয়ে বললেন এবার চাদরখানা ঘুচিয়ে বুকে লাগাও। আদেশমতে তিনি তা করার পর হতে যত হাদীস শুনেছেন পরবর্তীতে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত একটা হাদীস শরীফও ভুলেন্‌নি।

ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে কুদ্‌সীতে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে স্বয়ং রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয়বান্দা তথা আউলিয়া-ই কেরামের শান-মর্যাদা ও তাঁর দরবারে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাধনার ফলে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্যলাভ করতে পেরেছেন তাদেরকে

আউলিয়া বলা হয়। এঁরা আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন আর আল্লাহ্ও তাঁদেরকে ভালবাসতেন। তাদের জাগতিক-পারলৌকিক মুক্তির ঘোষণায় স্বয়ং আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন **اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ** (হুঁশিয়ার! নিশ্চয় আল্লাহর অলী যারা তাদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তিতও হবেন্ না)। আল্লাহর ওলীগণ এক আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়ার কোন অপশক্তিকে ভয় করেনা। কারণ তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিমান। এমনকি তাদের প্রত্যেক কদম মহান রব্বুল আলামীনের ইশারা ও কুদরতী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। যেমন- পবিত্র হাদীসে কুদ্সী শরীফে এরশাদ হয়েছে, মহান রব্বুল আলামীন এরশাদ করেন-

''আমার কতিপয় বান্দা অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করতে করতে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। এক পর্যায়ে এসে আমি নিজেই তাঁকে মুহাব্বত করি। আর যখন আমি তাঁকে মুহাব্বত করি, তখন তাঁর মুখ আমার মুখ হয়ে যায় যা দ্বারা সে কথা বলে। তার কান আমার কান হয়ে যায়, যা দ্বারা সে শুনে, তার চক্ষু আমার চক্ষু হয়ে যায়, যা দ্বারা সে দেখে, তার হাত আমার হাত হয়ে যায়, যা দ্বারা সে ধরে, তাঁর পা আমার কুদরতী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, যা দ্বারা সে চলাফেরা করে, সে যদি আমার কিছু প্রার্থনা করে আমি তা অবশ্যই প্রদান করি।''

[সূত্র: বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ৯৬৩ পৃষ্ঠা; মিশকাত শরীফ, ১৯৭ পৃষ্ঠা]

তাইতো আল্লাহর ওলীগণ মুখে যা বলেন তাই হয়ে যায়। হুজূর গাউসে আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী রদিয়াল্লাহু আনহু এবং সুলতানুল হিন্দ খাজায়ে খাজেগান খাজা গরীবে নাওয়ায হযরত মুঈনুদ্দীন চিশ্তী আজমেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনীতে হাজারো প্রমাণ রয়েছে যে তারা যখন মুখ দিয়ে কিছু বলেছেন, আল্লাহ্ পাক সেটা কবূল করে নিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত বেলায়তী ক্ষমতা দ্বারা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থানরত আউলিয়া-ই কেরাম দিশেহারা মানুষ আর বিপদগ্রস্তদের সাহায্য-সহযোগিতা করে চলেছেন।

দজলা নদীতে তুফানের কবলে পড়া জাহাজের যাত্রীদের আহ্বানে সুদূর বাগদাদের জামেয়া নেজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বসেই গাউসিয়াতের হাত বাড়িয়ে যাত্রীদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা, প্রাচীন কবরস্থান হতে ডাক দিয়ে মৃতব্যক্তিদেরকে জীবিত করা, এক মুহূর্তে হাজার হাজার মাইল দূরের মাহফিলে হাজির হওয়া, একই সময়ে সত্তর জন মুরীদের বাড়িতে হাজির হওয়া, স্ত্রীলোককে পুরুষে রূপান্তরিত করা -এভাবে অসংখ্য কারামাত হুজূর সায়্যিদুনা গাউসে পাক রদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীতে দেখা যায়। এসব অসম্ভব কিছু নয়। কারণ, আল্লাহর ওলীগণের হাত, চোখ, মুখ, পা, সবই আল্লাহর কুদরতী শক্তিতে ভরপুর। তাই

সেসব অঙ্গ দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।

আল্লাহর ওলীগণ মানুষকে কেবল দুনিয়াবী সঙ্কট থেকে উত্তরণ করেন -এমনটি নয়।

বরং পরকালের কঠিন শাস্তির কবল থেকে রক্ষা করার পথও বাতলে দিতে পারেন। তাই স্বয়ং আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাদের সান্নিধ্যে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেছেন- **يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ** (হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর এবং সত্যবাদী তথা আউলিয়া-ই কেরামদের সঙ্গী হয়ে যাও।) আল্লাহর ওলীদের ওসীলায় খোদার রহমত লাভ করা যায়। অধিকন্তু মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি যথার্থই বলেছেন-

گر تو خواہی ہم نشینی باخدا ☆ او نشینی در حضور اولیاء

(তুমি যদি আল্লাহর সান্নিধ্য বসতে চাও, তাহলে আউলিয়া-ই কেরামের দরবারে বস।) তিনি আরো বলেছেন- 'হক্কানী ওলীর দরবারে এক মুহূর্ত বসা শত বছরের রিয়ামুক্ত ইবাদতের চেয়েও শ্রেয়।' সুতরাং ওলীদের সান্নিধ্যে আসা-যাওয়ার মধ্যে জাগতিক- পারলৌকিক উভয় প্রকারের মঙ্গল নিহিত। পক্ষান্তরে তাঁদের বিরোধিতা করে কেউ কোন যুগে টিকে থাকতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। কারণ আল্লাহর বন্ধুদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা মানে আল্লাহর সাথে বিদ্বেষভাব পোষণ করা। আর জেনে রাখা দরকার, মহান আল্লাহর সাথে মুকাবিলা করা নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে নবী-ওলীর দুশমনদের কাছ থেকে দূরে থাকার এবং আউলিয়া-ই কেরামের সঙ্গ অবলম্বনের তাওফীক দান করুন। আ-মী-ন্ ।।

---><---